সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন • জানুয়ারি-এপ্রিল ২০২২

শিক্ষালোক

কোনো গাঁয়ে কোনো ঘর কেউ রবে না নিরক্ষর

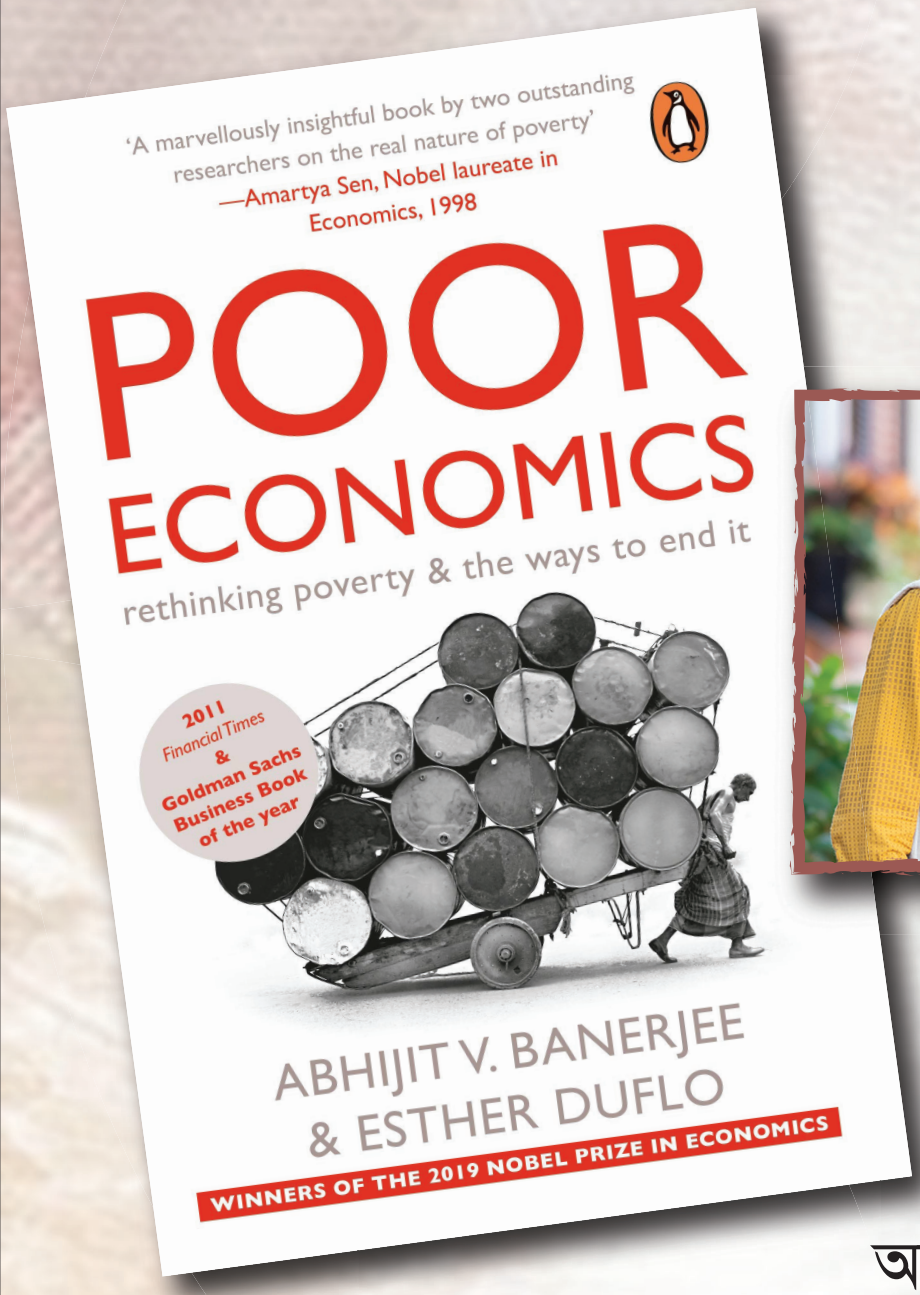

দারিদ্র্য ও শিক্ষা নিয়ে নোবেলজয়ী অভিজিৎ ও দুফলোর ভাবনা

বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস

১৭ মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে সিদীপের গ্রন্থাগার ও সভাকক্ষে এক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

এতে আলোচনা করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মিফতা নাঈম হুদা, পরিচালক (ফাইন্যান্স এন্ড অপারেশন্স) এস. আবদুল আহাদ, এজিএম (ডিজিটাইজেশন) অমিত কুমার রায়, গবেষণা ও ডকুমেন্টেশন কর্মকর্তা মনজুর শামস, জুনিয়র অফিসার (মার্কেটিং) রূপম মজুমদার ও জুনিয়র অফিসার (এমআইএস) মিঠুন দেব।

বঙ্গবন্ধু ও শিশুদেরকে নিয়ে কবিতা পাঠ করেন মনজুর শামস ও মিঠুন দেব। সঙ্গীত পরিবেশন করেন, তাওহীদুন্নবী, নুরুননাহার নিশি ও অভিব ইকবাল।

মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সিদীপের গ্রন্থাগার ও সভাকক্ষে একটি আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এতে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা বলেন, নতুন প্রজন্মকে আমাদের স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট ও বিজয়ের কথা আরও বেশি করে জানাতে হবে। সংস্থার পরিচালক (ফাইন্যান্স এন্ড অপারেশন্স) জনাব এস. আবদুল আহাদ মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনার কথা উল্লেখ করেন। এছাড়া আলোচনা করেন মিঠুন দেব ও মোহাম্মদ আলী।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কবিতা আবৃত্তি করেন মনজুর শামস, মিঠুন দেব ও শারমিন সুলতানা। দেশপ্রেমমূলক নৃত্য পরিবেশন করেন পূবালী রানি সূত্রধর ও আফরিন হোসেন ফারিতা। সঙ্গীত পরিবেশন করেন মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, মো. তাওহীদুন্নবী, নুরুননাহার নিশি, আফরিন হোসেন ফারিতা, শারমিন সুমি, জাহিদুল ইসলাম পলাশ, অভিব ইকবাল ও অন্যান্য।

সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন
ইমেইল: shikkhalokcdip@gmail.com, ফেসবুক: শিক্ষালোক বুলেটিন

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

শিক্ষালোক

জানুয়ারি - এপ্রিল ২০২২ ● ৯ম বর্ষ ১ম সংখ্যা

সূচি

নোবেলজয়ী অভিজিৎ ও
দুফলোর ভাবনায় শিক্ষা - আলমগীর খান ২

দারিদ্র্য নির্মূল নিয়ে গবেষণা করেন
নোবেলজয়ী অভিজিৎ - রঞ্জন মল্লিক ৬

পাবনার অনুকরণীয় দুগ্ধখামারি সালমা খাতুন
- মনজুর শামস, প্রতাপ চন্দ্র রায় ও মো. জাহিদ হাসান ১০

বাংলা নববর্ষ বাঙ্গালির উৎসব - রিয়াজ মাহমুদ ১৬

কবিতা ১৮

লেখকের সাথে আড্ডা ও জীবনানন্দ পাঠ ১৯

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রবীণ-জীবনের সমস্যা ২০

বই: প্রতিদিন প্রতিক্ষণ - শিশির মল্লিক ২২

পাঠাগার আন্দোলনের নতুন দিগন্ত - অলোক আচার্য ২৪

হারিয়ে যাওয়া বাংলার ঐতিহ্য - আশরাফ আহমেদ ২৬

প্রধান সম্পাদক
মিফতা নাঈম হুদা

সম্পাদক
ফজলুল বারি

নির্বাহী সম্পাদক
আলমগীর খান

ডিজাইন ও মুদ্রণ
আইআরসি ⊕ irc.com.bd

সম্পাদকীয়

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক অন্তর্ভুক্তিসহ গ্রামের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির উন্নয়নের জন্য আমাদের কাজ। বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ যেসব বিষয় নিয়ে কাজ করে নোবেলজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগ্রহও সেইসব বিষয় নিয়ে। তাঁর বিখ্যাত পুওর ইকোনমিকস বইটির মূল বিষয় এইসব। গ্রামের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির সঙ্গে মিশে ও তাদেরকে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করে তিনি ও তাঁর স্ত্রী এস্থার দুফলো যৌথভাবে লিখেছেন এ বই। এর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দারিদ্র্য দূরীকরণ বিষয়ক আলোচনা রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারক মহলের ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এবারকার শিক্ষালোকে আমরা ২০১৯এ নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ, দুফলো ও ক্রেমারের ভাবনা নিয়ে তাই অলোকপাত করেছি।

বেসকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের কর্মকাণ্ডের যে ফল প্রান্তিক মানুষের জীবনে দেখা যায় তেমনই একটি বাস্তবচিত্র নিয়ে একটি লেখা পাবনার দুগ্ধখামারি সালমা খাতুনকে নিয়ে। অভিজিৎ ও দুফলোর বইতেও প্রান্তিক দরিদ্র মানুষের এমন অনেক সফল জীবনসংগ্রামের উল্লেখ রয়েছে। এসব কাহিনি আমাদের উন্নয়নের যাত্রাপথকে আলোকিত করতে সাহায্য করে।

এ ছাড়াও নানা উপকরণে সজ্জিত বর্তমানের শিক্ষালোকটি।

ফজলুল বারি

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)
বাসা নং-১৭, রোড নং-১৩, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি লি:, শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা-১২০৭, ফোন: ৪৮১১৮৬৩৩, ৪৮১১৮৬৩৪।
Email : info@cdipbd.org, web: www.cdipbd.org

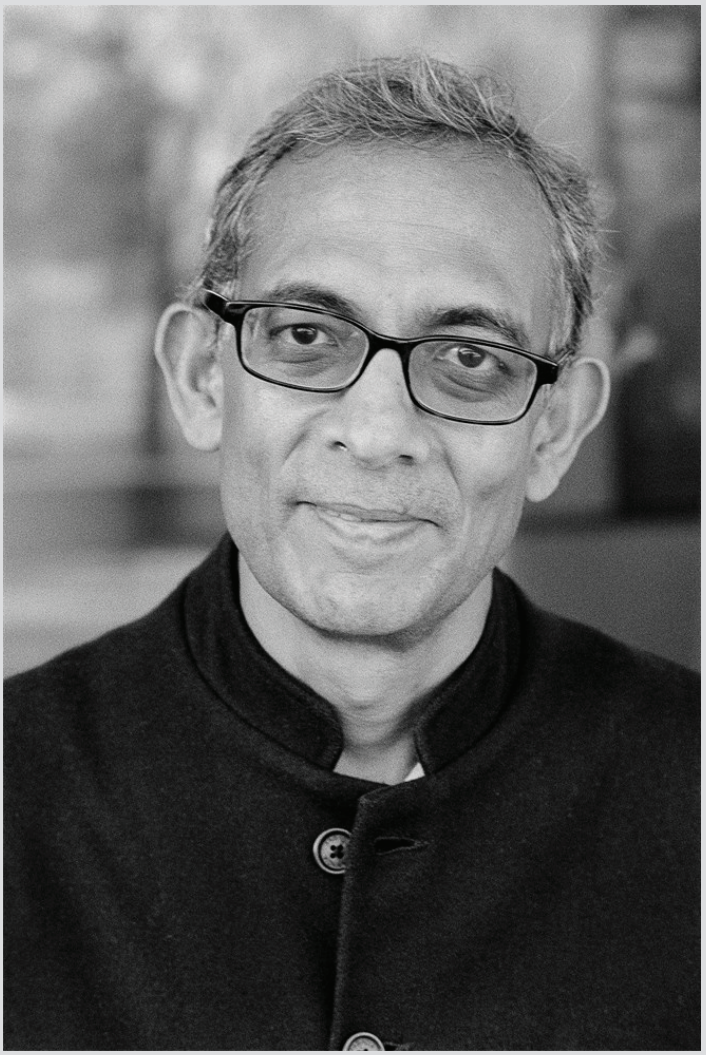

নোবেলজয়ী অভিজিৎ ও দুফলোর ভাবনায় উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষা

আলমগীর খান

অভিজিৎ ও দুফলোর পরামর্শ হচ্ছে “প্রত্যাশা কমানো, ন্যূনতম দক্ষতার ওপর জোর দেয়া ও প্রযুক্তি ব্যবহার” ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন। যে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা দরিদ্রদেরকে ঠকানো ছাড়া কিছু নয় যা “বিরাট সংখ্যক শিশুকে বলতে গেলে কিছুই দেয় না।”

অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় ও এস্থার দুফলো তাদের যৌথভাবে রচিত পুওর ইকোনোমিকস বইতে সমাজে ও জাতীয় জীবনে ক্ষুদ্রঋণের প্রভাব, প্রত্যাশা ও সীমাবদ্ধতার ওপর অন্তর্ভেদী আলো নিক্ষেপ করেছেন। এছাড়াও তারা আলোচনা করেছেন উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ে।

রাষ্ট্রে শিক্ষা বিস্তারে দুই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্য বিদ্যমান ও সেই অনুযায়ী দুটি দল: শিক্ষা-সরবরাহওয়ালা ও শিক্ষা-চাহিদাওয়ালা। সরবরাহবাদীরা মনে করে শিক্ষাকে কার্যকর উপায়ে মানুষের হাতে তুলে দিতে হবে। চাহিদাবাদীরা মানুষের চাহিদা অনুযায়ী তা সরবরাহের পক্ষে, বাজার সেখানে নিয়ামক।

শিক্ষা-সরবরাহওয়ালারা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য ঘোষণা করেছিলেন। তাতে শিশুর বিদ্যালয়ে কিছু শেখার আবশ্যকতা ছিল না, কেবল বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করলেই তাদের আশা পূরণ হলো। এমডিজি-কালে বাংলাদেশ, ইকুয়েডর, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, পেরু ও উগান্ডার বিদ্যালয়ে শিক্ষক অনুপস্থিতির হার ছিল বেশ উঁচুতে। শিক্ষার মান নিচে নেমে গেছে। অভিজিৎ ও দুফলোর মতে "দেখা গেল তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে যারা বাবা-মার দোকানপাটে বসে তাদেরকে সাহায্য করে তারা জটিল হিসাবনিকাশে বিদ্যালয়ে-ভর্তি ছেলেমেয়েদের চেয়ে পটু।"

অন্যদিকে শিক্ষা-চাহিদাওয়ালাদের মতে "শিক্ষা একরকমের বিনিয়োগ।" অতএব অর্জিত শিক্ষা থেকে যদি লাভসহ টাকা উঠে না আসে কেউ এতে বিনিয়োগ করবে না। আলোচ্য লেখকগণের মতে চাহিদাওয়ালাদের নীতি হলো 'না-শিক্ষা নীতি।'

তারা বলছেন, "শিক্ষার লাভ কেবল অর্থে নয়: শিশুমৃত্যুর হার কমাতে তাইওয়ান কর্মসূচির বড় ভূমিকা ছিল। মালাউইতে টাকা পাওয়ায় যে মেয়েশিশুরা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়েনি তারা অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভবতী হয়েছে কম। কেনিয়াতেও একই ফল দেখা গেছে।"

অর্থাৎ শিক্ষাকর্মসূচির সামাজিক প্রভাব ও ফল রয়েছে যেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কেবল আর্থিক লাভের হিসাব না করে রাষ্ট্রকে এক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে হবে। তবে কোথাও কোথাও দেখা যায়, ব্যক্তিমালিকানাধীন বিদ্যালয় সরকারি বিদ্যালয়ের চেয়ে ভাল শিক্ষা প্রদান করে। যদিও তারা আরও ভাল করতে পারত। বিদ্যালয়ে পড়া শেষ হওয়ার পর যেসব বিষয়ে শিশুশিক্ষার্থীরা দুর্বল সেইসব বিষয়ে আলাদা করে সংশোধনমূলক শিক্ষা অনেক ভাল ফল দিতে পারে। আর বিদ্যালয়ের নির্ধারিত সময়ের বাইরে এই বাড়তি শিক্ষা দিতে তেমন উচ্চশিক্ষার দরকার হয় না। স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে অল্প বা মাঝারি শিক্ষাপ্রাপ্ত যে কেউ এটি করতে পারেন।

তারা পিতামাতার 'প্রত্যাশার অভিশাপ' নিয়ে আলোচনা করেছেন। এরকম একটি প্রত্যাশা হলো, বাবামায়ের চোখে শিক্ষা প্রাথমিকভাবে তাদের সন্তানের জন্য সম্পদ আহরণের একটা পথ। সবচেয়ে সোজা পথটা হলো কোনো একটা সরকারি চাকরি লাভ যা বাগিয়ে নিতে তারা প্রাণপণ চেষ্টা করে থাকেন। এভাবে শিক্ষার মৌল উদ্দেশ্যটাই বিপথগামী হয়ে যায়।

আরেকটা ব্যাপার হলো: "বাবা-মা হরহামেশা নিজের সন্তানদের প্রতি তাদের সামনেই 'নির্বোধ' ও 'চালাক' ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করতে সবসময় উদগ্রীব থাকেন যা বিজয়ী বাছাই করার বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ (যেখানে পরিবারের বাকি সবাই বিজয়ী সন্তানকে যারপরনাই সহায়তা করে থাকে)। যদিও বেঁচে থাকার ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তির সংগ্রামে এ হচ্ছে একটা পারিবারিক কৌশল, এই প্রতিযোগিতায় যারা 'বিজয়ী' নয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রায় একই ঘটনা ঘটে বিদ্যালয়ে যা সমগ্র জাতির জন্য ক্ষতিকারক।"

এ পরিস্থিতিতে বড়লোকি স্কুলব্যবস্থা গড়ে ওঠে। লেখকগণ ঔপনিবেশিক শাসকদের স্বার্থে কিছু কেরানি ও স্থানীয় প্রভুদের প্রতি বশংবদ একটা গোষ্ঠী তৈরির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট উল্লেখ করেছেন। তারা বলেছেন, "নতুন নতুন শিক্ষার্থী অনেক আসা সত্ত্বেও শিক্ষকেরা এখনও সেই পুরনো অভ্যাসের জায়গাতেই পড়ে থাকেন এই ভেবে যে তাদের একমাত্র কর্তব্য হলো সেরা শিক্ষার্থীগুলোকে কঠিন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করে তোলা।" যা তাদের পরবর্তী জীবনে

সুখ-সমৃদ্ধির দরজা খুলে দিবে। ইতিমধ্যে আধুনিকায়নের নামে শিক্ষার নতুন নতুন বিষয় বিদ্যালয়ে যুক্ত হতে থাকে আর পাঠ্যবই হতে থাকে স্থূল ও ভারি। ফলশ্রুতিতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সমস্ত মনোযোগ চলে যায় সিলেবাস ও পাঠ্যবিষয় শেষ করার দৌড়ে, যা শিক্ষার পথে এক বিরাট বাধা।

এসব অঞ্চলে বিদ্যালয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় কারণ "বিষয় ও শিক্ষাদান দুইই তৈরি করা হয় বড়লোক ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ্যে, যারা নিয়মিত সাধারণ শিক্ষার্থী তাদের জন্য নয়।" উদ্দেশ্য হলো "অগ্নিপরীক্ষাতুল্য পরীক্ষার জন্য সেরা শিক্ষার্থীদেরকে আলাদা করা যাতে তারা জীবনে আরও উপরে লাফিয়ে ওঠার সুযোগ পায়, যার জন্য প্রয়োজন বিরাট সিলেবাস ও পাঠক্ষমতা আহরণ।"

এরকম শিক্ষাব্যবস্থায় বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর পিছনে পড়ে যাওয়া কোনো দুর্ঘটনা নয়, বরং অনিবার্য। এ ব্যবস্থার গোপন এজেন্ডা হলো "প্রতি বছর মোটা দাগে তলার শ্রেণি থেকে অনেককে সেঁচে ফেলা যাতে অগ্নিপরীক্ষাটা যখন আসবে তখন পাসের শ্রেষ্ঠ রেকর্ড হস্তগত করা যায়।"

এই কাঠামোর সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে প্রচলিত ইংরেজি শিক্ষাটাও খাপ খায়। বাবা-মা সন্তানকে ইংরেজি শিক্ষা দিতে চান, কিন্তু বুঝতে পারেন না বিদ্যালয়ে সেটি ঠিকমত দেয়া হচ্ছে কিনা। বাড়িতে সন্তানকে সাহায্য করার মত যদি কেউ না থাকে তবে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হয়ে দেখা দেয় ইংরেজিসহ বিরাট পাঠ্যতালিকা শেষ করার চাপ, শিক্ষার কিছু হোক বা না হোক।

তবে ধনীর সন্তানেরা এই সমস্যা পাশ কাটিয়ে যেতে পারে ব্যক্তিমালিকানাধীন স্কুলের সাহায্যে। যেখানে শিক্ষার্থীদেরকে তুলনামূলকভাবে বেশি যত্ন নিয়ে পড়ালেখা করানো হয়। অন্যদিকে দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না হতেই একটা বার্তা পেয়ে যায়: "তারা এখানে

> বাবা-মা হরহামেশা নিজের সন্তানদের প্রতি তাদের সামনেই 'নির্বোধ' ও 'চালাক' ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করতে সবসময় উদগ্রীব থাকেন যা বিজয়ী বাছাই করার বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ (যেখানে পরিবারের বাকি সবাই বিজয়ী সন্তানকে যারপরনাই সহায়তা করে থাকে)। যদিও বেঁচে থাকার ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তির সংগ্রামে এ হচ্ছে একটা পারিবারিক কৌশল, এই প্রতিযোগিতায় যারা 'বিজয়ী' নয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়

কাঙ্ক্ষিত নয় যদি তারা মেধার কোনো বিশেষ ঔজ্জ্বল্য দেখাতে না পারে।"

যার ফল হয় একসময় তাদের অনেকেরই স্কুল থেকে ঝরে পড়া। এভাবে "উন্নয়নশীল দেশসমূহের শিক্ষাব্যবস্থা দুটি মৌলিক লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হয়: প্রত্যেকের জন্য ন্যূনতম দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি এবং শিক্ষার্থীর প্রতিভার দিক খুঁজে বের করা।"

অথচ এ দুটি লক্ষ্য পূরণ কেবল যে সম্ভব তাই নয়, সহজও। তারা উল্লেখ করেছেন বিদ্যালয়ের পরে বিভিন্ন সংশোধনমূলক শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করার কথা। এসব শিক্ষাকার্যক্রমে কোনো বিষয়ে দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীকে আলাদাভাবে বাড়তি শিক্ষাদান করে সক্ষম করে গড়ে তোলা যায়।

এ ব্যাপারে তাদের একটি পরামর্শ হলো ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির বা গ্রেডের মাঝে সীমান্তদেয়াল না তোলা। যাতে যে শিশুটি বয়সের কারণে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে তার যদি দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী কোনো বিষয়ে ভাল করে পড়া ও দক্ষতা অর্জন প্রয়োজন হয় সে যাতে তা পায় বিব্রত না হয়েই।

অভিজিৎ ও দুফলোর পরামর্শ হচ্ছে "প্রত্যাশা কমানো, ন্যূনতম দক্ষতার ওপর জোর দেয়া ও প্রযুক্তি ব্যবহার" ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন। যে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা দরিদ্রদেরকে ঠকানো ছাড়া কিছু নয় যা "বিরাট সংখ্যক শিশুকে বলতে গেলে কিছুই দেয় না।"

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় দুষ্টক্ষতের মত বিরাজ করছে একটি অসুস্থ ব্যবস্থা: ভাল ও নামজাদা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ। দেশের তথাকথিত ভাল স্কুলকলেজগুলো ধনিক শ্রেণি থেকে আসা মেধাবী ছেলেমেয়েকে ভর্তি করে পরীক্ষায় তাদেরকে দিয়ে ভাল ফল করিয়ে শিক্ষার বাজারে তাদের নাম ও ব্র্যান্ড ধরে রাখে। পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীকে তারা নিতে চান না। তাহলে তাদের ভাল পড়ালেখা করানোর

কৃতিত্বটা আসলে কী? যে শিক্ষক আজকের পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীকে দিয়ে ভাল ফল করাতে পারেন, তিনিই তো প্রকৃত মানসম্মত শিক্ষক। অথচ প্রচলিত ব্যবস্থাটা ঠিক তার উল্টো। অভিজিৎ ও দুফলোর মতে এক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে "বিদ্যালয়গুলোকে সেইসব শিক্ষার্থীর জন্য কাজ করতে হবে যেসব শিক্ষার্থী তাদের আছে, যাদের পেলে তারা খুশি কেবল তাদের জন্য নয়।" আর সেইসঙ্গে প্রত্যেক শিশুকেই ন্যূনতম দক্ষতা অর্জনের ও নিজস্ব মেধা বিকাশের সুযোগ করে দেয়া।

অভিজিৎ ও দুফলোর অভিমত ও দৃষ্টিভঙ্গি সেইসব দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে সাহায্য করবে যেখানে শিক্ষার ঘোষিত লক্ষ্য ও প্রত্যাশিত ফল আর যাই হোক – দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদেরকে বঞ্চনা ছাড়া বলতে গেলে কিছুই দেয় না। তাদের পরামর্শ নিঃসন্দেহে কিছু কাজ দিবে। তবে তা সীমিত। তাদের আলোচনা মূলত এসব দেশের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকার্যক্রমকে কীভাবে আরও ফলপ্রসূ করা যায় আর মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থা এ থেকে কী কী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তা নিয়ে।

তারা দেখেছেন শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষা-সহায়ক/সহায়িকাদের (প্যারাটিচার) ওপর নজরদারি বাড়িয়ে ও তাদেরকে আর্থিক প্রণোদনা দিয়ে শিক্ষক অনুপস্থিতি হ্রাস করা যায়। এর ফলে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া কমে মূলধারার বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তি বাড়ে। তবে ক্যামেরা-নজরদারি রাজনৈতিক কারণে সরকার পরিচালিত বিদ্যালয়ে সম্ভব নয় বলে তারা এখানে স্বল্পমেয়াদী চুক্তিভিত্তিক প্যারাটিচার যুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন।

কিন্তু প্যারাটিচার দিয়ে সংশোধনীমূলক শিক্ষা বা রেমিডিয়াল টিউটরিংয়ের যে পরামর্শ তারা দিয়েছেন তা মূল সংকটের সমাধান নয়। পুওর ইকোনোমিকস উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষায় অনেক ফাঁকি ধরিয়ে দেয় ঠিক। তবে কেবল নোবেলজয়ী অভিজিৎ ও দুফলোর কথা শুনলে এসব দেশ কখনও শিক্ষায় উন্নত দেশের সমকক্ষ হতে পারবে না।

শিক্ষকতা বিশেষত প্রাথমিক পর্যায়ে হতে হবে অত্যন্ত সম্মানজনক ও গুরুত্বপূর্ণ পেশা। শিক্ষক সংকট দূর করতে শিক্ষকের সংখ্যা বাড়াতে হবে, আরও প্রশিক্ষণ দিতে হবে, বেতন ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে, দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিতা বাড়াতে হবে এবং আরও নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া যেসব দেশে উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা রয়েছে, তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে অবশ্যই। ■

দারিদ্র্য নির্মূল নিয়ে গবেষণা করেন নোবেলজয়ী অভিজিৎ

রঞ্জন মল্লিক

২০১৯ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনজন। এরা হলেন অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, এস্থার দুফলো ও মাইকেল ক্রেমার – বাঙালি, ফরাসি ও মার্কিনী। তিনজন একত্রিত হয়ে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কাজ করে এ বিরল সম্মানের অধিকারী হন।

অমর্ত্য সেনের পর অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় আরেক বাঙালি যিনি অর্থনীতিতে নোবেল জিতে নিলেন। অভিজিৎ কলকাতার মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। প্রেসিডেন্সি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান হিসেবে তার বাবা দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় সুবিদিত। তারই ছেলে অভিজিৎ বন্দোপাধ্যায় দিল্লীর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে হার্ভার্ডে গিয়েও তিনি স্নাতকোত্তর হন। বর্তমানে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির অধ্যাপক। উল্লেখ্য যে, বাঙালির ঘরে প্রথম নোবেল পুরস্কার আসে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে ১৯১৩ সনে। তার পঁচাশি বছর পরে ১৯৯৮ সালে অমর্ত্য সেন পেলেন নোবেল। তারপর ২০০৬ সালে আরেক বাঙালি ড. মুহাম্মদ ইউনূস শান্তিতে নোবেল পান এবং তার তের বছর পর ২০১৯ সালে এলো অভিজিতের নোবেল।

অভিজিৎকে আমরা সাধারণ বাঙালি কমই চিনি। তবে তাকে চেনেন ইউরোপ আমেরিকার ঐতিহ্যমণ্ডিত বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে প্রবেশাধিকার যাদের আছে তারা। অমর্ত্য সেনের মতো তত্ত্ব নিয়ে অতো বই লেখেননি তিনি। সেইসব কারণে হয়তো আমরা কম জানি তাঁর সম্পর্কে। তবে কাজপাগল এ বিদ্বান ব্যক্তি নীরবে অতি সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করছেন প্রায় ২০ বছর ধরে। টিম নিয়ে কাজ করেন। দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য অসাধারণ গবেষণালব্ধ কাজ তাঁকে নোবেল খ্যাতি এনে দেয়। তারপরেই বিশ্বজুড়ে আলোচনার টেবিলে ঝড় ওঠে। তবে তিনি নোবেল খ্যাতি একা অর্জন করেন নি, নোবেল কমিটি তার টিমকে এ খ্যাতির অংশীদার করেছে।

নোবেল পুরস্কারবিজয়ী এ তিনজন যে গবেষণার জন্য খ্যাতি লাভ করলেন তা একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে যার ফলে যেসব নীতিগত হস্তক্ষেপের দ্বারা সরকার

চাইছে দারিদ্র দূরীকরণ করতে সেগুলো কতটা কার্যকর সেটি প্রমাণ করা সম্ভব হবে। কারণ একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বে দারিদ্র্য হ্রাস করতে সরকার থেকে শুরু করে যেসব প্রতিষ্ঠান ও দাতাগোষ্ঠি কাজ করছে তারা চাইছে এসব নীতি পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হোক।

গত বিশ বছর ধরে নানা দেশে ঘুরে নোবেলবিজয়ী এই তিনজন যা করে আসছেন তা উপরোক্ত নীতি-পরিকল্পনা প্রয়োগের কার্যকারিতা মাপার পদ্ধতি নির্মাণ। এই হিসাবটা বা ব্যাপারটা সাধারণ মানুষের কাছে অনেকটাই খটমটে বা জটিল। অভিজিৎ ও দুফলো তাদের 'পুওর ইকোনোমিকস' বইতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ ও সেক্ষেত্রে জটিল পরিস্থিতি মোকাবিলার বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন।

রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সের জুরিদের ভাষ্য ছিল, উক্ত নোবেল পুরস্কার প্রাপকেরা এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রবর্তন করেছেন যার দ্বারা পৃথিবীতে দারিদ্র্য নিবারণের পক্ষে উপযুক্ত নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি বাছাই করা সম্ভব। এটিই অভিজিৎ ও দুফলোর এবং ক্রেমারের কাজের প্রাসঙ্গিকতার স্মারক। কারণ অর্থশাস্ত্রের সামনেও আসল সমস্যা হলো দারিদ্র্য কেন এতদিন ধরে যাই যাই করেও যাচ্ছে না, তার উত্তর খুঁজে বের করা।

মূল কথায় আসা যাক, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইকেল ক্রেমার ১৯৯০এর দশকের মাঝামাঝি শুরু করলেন এক পরীক্ষা-নিরীক্ষার নতুন প্রয়াস। যে পরীক্ষাটি অনেকের নজর কেড়েছিল। কেনিয়াতে তা হলো – স্কুল-শিশুদের কৃমিনাশক ঔষধ দেওয়া বা স্কুল-শিক্ষকদের জন্য এক আর্থিক পুরস্কার নির্ধারণ করা যা ছাত্রদের শিক্ষাগত উন্নতির সঙ্গে জড়িত। এর উপর নির্ভর করেই অভিজিৎ ও দুফলো শুরু করেন হার্ভার্ডের অল্প দূরত্বে এমআইটিতে তাদের একই পথে যাত্রা। তবে তাদের পরীক্ষা উত্তরোত্তর বিস্তৃত হয় অনেক দেশে। উন্নয়ন ও দারিদ্র্যমোচনের বৃহদাকার প্রশ্নগুলি তারা ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে নেন বলে

> অভিজিৎ বলেন, স্বপ্নের পথহাঁটা অসুখ। কিন্তু ক্ষুদ্রত্বের সুরে মজে 'আমাদের দিয়ে হবে না' এই বিকারে ডুবে থাকা আরও বড় ব্যাধি। দরিদ্রের অর্থনৈতিক জীবনে প্রতিদিনের পথচলার নানাদিক ঠিকভাবে বুঝতে পারলে, অসাম্যতাড়িত অব্যবস্থায় তা কীভাবে এলোমেলো হয়ে আছে তা পরখ করতে পারলে সেসব ঠিক করার পথ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

পরীক্ষাগুলি হয়ে ওঠে পোর্টেবল, অর্থাৎ অন্যান্য অঞ্চলের পরিস্থিতিতেও পুনরায় ব্যবহার করা সম্ভব। ক্রমে ২০০৩ সালে অভিজিৎ ও দুফলো গড়ে তোলেন আবদুল লতিফ জামিল পভার্টি অ্যাকশন ল্যাব (জে-প্যাল) যেখানে আপাতত চারশো অর্থনীতিবিদ কর্মরত। বিবাহিত দম্পতি অভিজিৎ ও দুফলো দুজনেই এমআইটির অধ্যাপক। শিক্ষকতার ফাঁকে ফাঁকে তারা পৃথিবী টহল দেন জে-প্যালের পরীক্ষাসমূহ দেখাশোনা করতে।

এইসব ভ্রমণ ও গরিব মানুষের জীবনের নানা টুকিটাকি নিয়ে অভিজিৎ ও দুফলো লিখেছেন তাদের বহুলপঠিত (২০১১ সালের) বই পুওর ইকোনমিকস। বইটি অনেক পুরস্কার ও অভিনন্দন কুড়িয়েছে। এতে আছে তৃতীয় বিশ্বের অতি সাধারণ মানুষের জীবনের কথা ও সমাজে টিকে থাকার জন্য গরিব মানুষের আশা-নিরাশার খণ্ডচিত্র।

এমআইটির এই অধ্যাপক দম্পতি নতুন আরেকটি বই লিখেছেন গুড ইকোনমিকস ফর হার্ড টাইমস – ভিন্ন ধর্মী ও ভিন্ন স্বাদের বই। বর্তমান বিশ্বে যে মন্দার ছায়া পড়েছে বইটির আলোচ্য বিষয় তা। তবে এখানে এই বইটি আলোচ্য নয়। পুওর ইকোনমিকসে তারা যেসব সাধারণ মানুষের কথা বলেছেন তার মাঝ থেকে একটি বাস্তব ঘটনা তুলে ধরা হলো। এটি সাধারণ মানুষের আশা-নিরাশার একটি বাস্তব চিত্র। গল্পটি ইন্দোনেশিয়ার একটি অতি সাধারণ মেয়ের।

নাম তার ইবু টিনা। সে দর্জির কাজ করত। তার বিয়ে হলো কাপড়ের ব্যবসায়ীর সাথে। তাদের তখন চারজন কর্মচারী। ব্যবসা চলছিল ভাল। গোল বাঁধল যখন এক পরিচিত ব্যবসায়ীর ৩,৭৫০ ডলার মূল্যের চেক বাউন্স করল। পুলিশের সাহায্য চাওয়া হলে পুলিশের বড়কর্তা চেকের এক দশমাংশ ঘুষ দাবি করে তদন্ত শুরু করতে। এক সপ্তাহের পর অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অপরাধী কিছু অর্থ ফেরত দিয়ে জামিনে খালাস পায়, শুধু মুচলেকা দেয় বাকি টাকা পরে ফেরত দিবে বলে। যেটুকু টাকা ফেরত দেয় তার অর্ধেক পুলিশকে দিতে হলো। প্রতারক ঐ ব্যবসায়ীর আর কখনো দেখা মিলল না। ইবু টিনারা খুব চেষ্টা করেছে ঘুরে দাঁড়াতে। সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করেছে ২,৮০০ ডলার ঋণ। ঝুঁকি কমানোর জন্য সেই মূলধন দিয়ে জামাকাপড় না তৈরি করে কোনও এক সাপ্লায়ারের কাছ থেকে কিনেছে রেডিমেড হাফপ্যান্ট। কিন্তু খুচরো দোকানিরা তা নিতে রাজি হলো না। ইতিমধ্যে ইবু টিনার স্বামীও তাকে ছেড়ে চলে গেছে। চার-চারটি সন্তান নিয়ে সে মায়ের ঘরে ফিরে আসে এবং সাথে

অভিজিতের কাজকর্মের মূলমন্ত্র হচ্ছে, গরিবের জীবনকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। স্বল্প আর্থিক সঙ্গতির মধ্যেও গরিবরা কীভাবে নিজেদের ভাল রাখে, তা আমাদের শিক্ষণীয় হতে পারে। আমরা প্রায়শই পূর্বনির্ধারিত এবং ওপর থেকে নেওয়া সিদ্ধান্তের বশবর্তী হয়ে আমাদের করুণা বর্ষণে গরিবদের জীবনকে সিক্ত করার চেষ্টা করি। ভাবখানা এমন যে, আমি যেমনভাবে তাদের ভাল রাখতে চাইব, তারাও সেরকমভাবেই থাকবে। অভিজিতের ভাবনার সঙ্গে এখানেই এদের মূল তফাত। তিনি মনে করেন, গরিব মানুষ আমাদের চেয়ে অনেক বেশি সৃষ্টিশীল। গরিব মানুষকে অলস অবসাদগ্রস্ত ভেবে তাদের করুণার পাত্র হিসেবে দেখতে চাওয়া মূর্খামি মাত্র।

অবিক্রিত হাফপ্যান্টের পাহাড়। জীবনের সেই কঠিন সময়ে ইবুর সাথে লেখকদের সাক্ষাৎ। সে তাদের জানায় মায়ের ঘরের এক কোণে সে খুলবে মুদির দোকান, আর সেই সাথে এই হাফপ্যান্টগুলিও বিক্রি করবে। গল্পটি মর্মস্পর্শী।

অভিজিৎ যে সত্যটি চোখের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন তা হলো, ছাপোষারাই ঝুঁকির ব্যবসায় নামে। কারণ, তাদের আর কোনও উপায় নেই। যারা লক্ষ্মীর কৃপা থেকে যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত, তাদের জীবনকথা, ভাবনা আর তাদের কুঁড়ে ঘরে ঠিকরে পড়া আলোর খোঁজ দিতে চান নোবেল বিজয়ী অভিজিৎ। তার লক্ষ্য এইসব জীবনের অন্ধকার যাতে আরও একটু কমে, আর দূর করতে পারলে তো কথাই নেই। অভিজিৎ বলেন, স্বপ্নের পথহাঁটা অসুখ। কিন্তু ক্ষুদ্রত্বের সুরে মজে 'আমাদের দিয়ে হবে না' এই বিকারে ডুবে থাকা আরও বড় ব্যাধি।

দরিদ্রের অর্থনৈতিক জীবনে প্রতিদিনের পথচলার নানাদিক ঠিকভাবে বুঝতে পারলে, অসাম্যতাড়িত অব্যবস্থায় তা কীভাবে এলোমেলো হয়ে আছে তা পরখ করতে পারলে সেসব ঠিক করার পথ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। এই প্রেরণা থেকেই অভিজিৎ শুরু করলেন অর্থনৈতিক গবেষণার নতুন এক পদ্ধতির অনুশীলন। এর মূল লক্ষ্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক, বস্তুনিষ্ঠ, প্রায়োগিক প্রামাণ্য তথ্য খুঁজে বের করা। পূর্বনির্ধারিত ভাবনা আর এতদিন ধরে চলে আসা সিদ্ধান্তগুলো ঠিক না বেঠিক, তা মুক্তমনের ছাত্রের মতো অনুশীলন করে বুঝতে হবে। এটা না করে দরিদ্র মানুষের ওপর নিজেদের ভাবনা চাপিয়ে দিলে সমাজকল্যাণের যে ফল আমরা পেতে চাইছি তা পাওয়া যাবে না। পদ্ধতিগত পরিবর্তনের প্রেরণায় অভিজিৎ বিনায়ক বন্দোপাধ্যায় পৌঁছে গেলেন নতুন এক আঙ্গিনায় – চিকিৎসা-গবেষণায়।

সহযোগী মাইকেল ক্রেমার আর অভিজিৎ বিনায়ক গুটিগুটি পায়ে শুরু করলেন তাদের ছোট ছোট বাস্তবভিত্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। যে পদ্ধতি তারা প্রয়োগ করলেন তা চিকিৎসা বিজ্ঞানের জগতে খুবই পরিচিত। কেতাবি নাম র‍্যান্ডোমাইজড কন্ট্রোলড ট্রায়াল (Randomised Controlled Trial)। কোন ঔষধ কাজ করে অথবা করে না তা বোঝার জন্য ঔষধের গবেষণায় এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। বাজারজাত করার আগে অর্থাৎ ব্যাপক মানুষের ব্যবহারের পূর্বে একটি ছোট জনসমষ্টির ওপর ব্যবহার করে দৃঢ়ভাবে বুঝে নেয়া হয় ঔষধটিতে আদৌ ফল পাওয়া যাবে কি না, পাওয়া গেলেও তা কতটা লাভজনক। এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াই বা কী কী হতে পারে ইত্যাদি। এই নিরীক্ষা পদ্ধতিতে একজন ঔষধ সেবন করেন, আর সব দিক দিয়ে তুলনামূলকভাবে সমান গুণসম্পন্ন আর একজন এ ঔষধ সেবন করেন না। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে একই অসুখে ভোগা এ দুজন মানুষের মধ্যে তুলনা করে বোঝার চেষ্টা করা হয় ঔষধের কার্যকারিতা।

অভিজিতের দৃষ্টিতে সামাজিক অসাম্যের, অব্যবস্থার আর দুর্নীতির নানা রূপ দরিদ্র মানুষের জীবনে ভিন্ন ভিন্ন কুপ্রভাব ফেলে। তার কাঁথায় অনেকগুলি ভাঁজ থাকে। এই ছোট ছোট ভাঁজগুলিকে যদি ঠিক করে নেয়া যায়, তা হলে অনেক ছোট ছোট ফাঁকফোকর বন্ধ হয়ে দরিদ্রের জীবনে একটু স্বস্তি আসতে পারে।

কেনিয়ায় মাইকেল ক্রেমার শুরু করলেন কৃমির ঔষধ খাইয়ে শিশুদের স্কুলে নিয়ে আসা এবং বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটানো যায় কি না সেই গবেষণা। সেই পদ্ধতি – র‍্যান্ডোমাইজড কন্ট্রোলড ট্রায়াল। উদয়পুরে সেবা মন্দির নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাথে কাজ করতে গিয়ে অভিজিৎ এবং তার সহকারীরা প্রথম এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। টিকা প্রদান চলছিল উদয়পুরের গ্রামে গ্রামে। সেবামন্দিরের নার্সরা টিকা দিতে গিয়ে দেখলেন মানুষের অংশগ্রহণে অনীহা। অভিজিৎ পরামর্শ দিলেন – বাচ্চার টিকার সাথে এক কেজি ডাল দেওয়া যাক, দেখা যাক কি ফল দাঁড়ায়। তাতে টিকাদানের

সাফল্য বাড়ে কিনা। দুটি দলে ভাগ হয়ে এক দল শিশুর টিকার সাথে ঐ পরিবারকে এক কেজি ডাল দিল। আর একটি দল শুধু শিশুকে টিকাই দিল। সাথে পরিবারকে কোন কিছু দিল না। দেখা গেল ডাল দেওয়াতে শিশুর টিকাপ্রদান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের হার বেড়ে গেল বহুগুণ। সামাজিক প্রকল্পের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে এই প্রথম এত ভালোভাবে এ পদ্ধতির প্রয়োগ হলো। সেই শুরু পথ চলা, তারপর থেকে গরিবের জীবনে ছোট ছোট বিষয়গুলোকে বোঝা, তা থেকে মুক্তির পরিবর্তনযোগ্য উপাদান বের করে তা নিয়ে গবেষণা করা, আর তার প্রয়োগ এই নিয়ে মেতে উঠলেন অভিজিৎ। তার সহযোগী ছিলেন মাইকেল ক্রেমার আর এস্থার দুফলো। ছোট ছোট ব্যবহারিক পরিবর্তন এবং কল্যাণমূলক পদেক্ষপ নিয়ে বিশ্বের অগণিত দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষের জীবনকে কীভাবে উন্নত করা যায় তা নিয়ে চলতে থাকে তাদের গবেষণা।

অভিজিতের কাজকর্মের মূলমন্ত্র হচ্ছে, গরিবের জীবনকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। স্বল্প আর্থিক সঙ্গতির মধ্যেও গরিবরা কীভাবে নিজেদের ভাল রাখে, তা আমাদের শিক্ষণীয় হতে পারে। আমরা প্রায়শই পূর্বনির্ধারিত এবং ওপর থেকে নেওয়া সিদ্ধান্তের বশবর্তী হয়ে আমাদের করুণা বর্ষণে গরিবদের জীবনকে সিক্ত করার চেষ্টা করি। ভাবখানা এমন যে, আমি যেমনভাবে তাদের ভাল রাখতে চাইব, তারাও সেরকমভাবেই থাকবে। অভিজিতের ভাবনার সঙ্গে এখানেই এদের মূল তফাত। তিনি মনে করেন, গরিব মানুষ আমাদের চেয়ে অনেক বেশি সৃষ্টিশীল। গরিব মানুষকে অলস অবসাদগ্রস্ত ভেবে তাদের করুণার পাত্র হিসেবে দেখতে চাওয়া মূর্খামি মাত্র। এ তিন নোবেল বিজয়ীর কাজ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশ্ববাসীকে নতুন দিশা দেখিয়েছে।

অভিজিত বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, বহু মানুষকে নিয়ে কাজ করতে গেলে যা অনিবার্যভাবে লাগে তা হলো, নানা মানুষের ভাবনার বৈচিত্র্যকে স্বাভাবিক বলে ভেবে নিয়ে তা অধীর আগ্রহে তুলে নেওয়া। সহনশীলতা, ধৈর্যের সঙ্গে বহু মানুষকে শোনা, সবাইকে নিয়ে চলা। দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষের জীবনকে আরও একটু ভাল রাখার পদ্ধতিগুলি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বোঝার জন্য অভিজিৎ যে আখড়া তৈরি করেছেন তার মূল শক্তি এসব ভাবনা। বাউলের আখড়ার মতো – বহু মানুষ বহু জায়গায় নিজের সুরে গান গাইছে। মূল ভাবধারা এক – পরখ করো, পূর্বসিদ্ধান্ত নিয়ে পরিচালিত পথে নয়, বরং মুক্ত মনে। খুঁটিয়ে দেখো। যা এতদিন জেনে এসেছো, শুনে এসেছো, তাকে অবিনশ্বর সত্য বলে ভাবতে শুরু করলেই গবেষণার ইতি। তাই নির্মোহ দৃষ্টিতে সবকিছুর বিচার করতে হবে।

অভিজিত তার পুওর ইকোনমিক্স থেকে গুড ইকোনমিক্স – সর্বত্রই একটা কথা বলে যাচ্ছেন, মানুষের নিজস্ব ভাবনা তোমার চেয়েও শক্তিশালী হতে পারে। গরিবরা সৃষ্টিশীল, তাদের কথা শুনতে হবে মুক্ত মনে। যেখানে গবেষণায় বড়সড় তত্ত্বের প্রয়োজন আর তা প্রতিষ্ঠিত ভাবনার আশেপাশে ঘোরাফেরা করা – সেখানে অভিজিৎ হাঁটেন উল্টো পথে। জীবনকে খোলামেলাভাবে দেখা ও ভাবনার ছোট ছোট উপাদান বাছাই আর তা পরখ করে দেখা। অভিজিতের ভাবনায় বিচরণ করে – কীভাবে দরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে।

সারা পৃথিবীতে দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পগুলিতে অন্যতম সমস্যা তথ্য-নির্ভরতার প্রতি অনীহা। যারা নীতি নির্ধারণের দায়িত্বে থাকেন, তারা নব্য রাজন্যের মতো তাদের মহান ইচ্ছা-সম্পৃক্ত নানা প্রকল্পের অবতারণা করেন। তারা সাধারণভাবে অসহিষ্ণু এবং চটজলদি ফলপিপাসু হয়ে থাকেন। অভিজিতের গবেষণা এদেরকেই আরও বাস্তবমুখী করে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। নীতি নির্ধারক ও রাজনীতিবিদের মাঝে তথ্য ও প্রমাণ নির্ভরতা বাড়িয়ে তুলতে পারলে গরিবের মঙ্গল। অভিজিতের গবেষণা বলছে, ছোট ছোট নানা উদ্যোগের মধ্য দিয়ে বাবুই পাখির বাসা তৈরির মতো করে গরিবরা তাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারে। ■

লেখক: সাংবাদিক ও তথ্যচিত্র নির্মাতা

পাবনার অনুকরণীয় দুগ্ধখামারি

সালমা খাতুন

মনজুর শামস, প্রতাপ চন্দ্র রায় ও মো. জাহিদ হাসান

একজন নারী বহ্নিশিখার সন্ধান পেয়ে ছুটে গিয়েছিলাম পাবনায়। ১৭ নভেম্বর ২০২১এর বিকেলে যখন তার দেখা পেলাম তিনি তখন দু পায়ে গামবুট পরে হাতে পানির পাইপ ধরে তার গরুর ঘর ধুয়ে সাফসুতরো করছিলেন। টিনের দোচালা গরুর ঘরটির মেঝে পাকা আর চারপাশে বাঁশের চটির বেড়া। অনেকটা বাগানের বেড়ার মতো। আলো-হাওয়ার অবাধ যাতায়াত। খড়কুটোর তলছাদের ফাঁক গলে আসা কয়েক চিলতে রোদ পড়েছে তার মুখে। কপালে বিন্দু বিন্দু জমে থাকা পরিশ্রমের ঘাম রোদের ছোঁয়ায় মুক্তোদানার মতো দ্যুতি ছড়াচ্ছিল। গরুর ঘরের পাশ ঘেঁষে ছাগল পোষার ছোট্ট এক মাচানঘর। উঠোনের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত থেকে উঁকি দিচ্ছিল বায়োগ্যাস তৈরির অবকাঠামো। জানতেন আমরা আসবো, তারপরও আমাদের দেখে কিছুটা বিচলিত হলেন যেন! হাতে ধরা পানির পাইপটি মেঝেতে ফেলে দৌড়ে ঘরে ঢুকে গেলেন আমাদের বসার ব্যবস্থা করতে। কিছুকাল আগে এক সড়ক দুর্ঘটনায় পায়ের হাড় ভেঙে যাওয়া তার স্বামী ক্র্যাচে ভর দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। এক লড়াকু দম্পতির সহৃদয় সম্ভাষণে আমরা প্রীত হলাম।

সিদীপের কৃষি ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের যে দলটি এসএমএপি ঋণী সদস্যদের কারিগরি ও প্রযুক্তির ওপর প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দিয়ে থাকে তারাই এই কৃতী ও সফল গরুর খামারি সালমা খাতুনের সন্ধান দিয়েছিলেন। পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলার গুনাইগাছা ইউনিয়নে পৈলানপুর গ্রামে সালমা খাতুন (৩৮) গরুর যে খামার গড়ে তুলেছেন তার সফলতা গর্ব করে বলার মতো। এই অঞ্চলটি চলন বিলের প্রভাবভুক্ত। আবাদী জমির বেশির ভাগই ছয় মাস থাকে পানির নিচে। বিকল্প জীবিকা খুঁজতে গিয়ে সে কারণেই বোধ করি এ এলাকার মানুষ গরুর খামার গড়ে তোলায় ঝুঁকে পড়েছিল। দেশের সিংহভাগ দুধ উৎপাদন করে থাকে এই পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার মানুষ। সালমা খাতুন এবং তার স্বামী মো. আজিজুল হকও (৪২) সে পথেই হেঁটেছেন। তবে তাদের এই পথটি বেছে নেয়ার এবং তাতে ঈর্ষণীয় সাফল্য লাভের পেছনে রয়েছে এক অকুতোভয় জীবনসংগ্রামের গৌরবময় কাহিনি। যে কাহিনি অন্যদেরও উদ্বুদ্ধ করে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায়। সিদীপ বরাবরই এ ধরনের উদ্যোক্তাদের নানাভাবে সহায়তা করে থাকে। সালমা খাতুনের বেলায়ও তেমনটিই ঘটেছে। নিজের উন্নয়ন প্রয়াসে তিনি সব সময়ই সিদীপকে পাশে পেয়েছেন।

নিজের সদিচ্ছাগুলো পূরণ করতে গিয়ে প্রবল বাধার মুখে পড়তে হয়েছে সালমা খাতুনকে। বাবার সংসারে এবং সেখান থেকে স্বামীর সংসারে এসেও। তার বাবার বাড়ি এই চাটমোহর উপজেলারই আনকুটিয়া গ্রামে। তার বাবা একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা। চার বোন এক ভাইয়ের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। ভাইটি সবার ছোট। ২০০৪ সালে এসএসসি পাস করেন সালমা। বোনদের ভেতরে লেখাপড়া এবং খুঁটিনাটি নানা বিষয় নিয়ে ছিল খুব রেষারেষি। তাই ২০০৬ সালে একই উপজেলার পৈলানপুর গ্রামের মো. আজিজুল হকের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর অনেকটাই যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। বিয়ের পর আজিজুল তাকে এইচএসসিতে ভর্তি করে দিলে তিনি নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু সেই স্বপ্ন বিবর্ণ হতে খুব বেশি সময় লাগেনি।

স্বামীর সহযোগিতা পেলেও শ্বশুরবাড়ির পরিবেশ ছিল তার ইচ্ছে পূরণের প্রতিকূল।

আজিজুলরা ছিলেন চার ভাই, পাঁচ বোন। সবাই স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করতেন। ভাইদের ভেতরে তিনি দ্বিতীয়। বড় ভাই আনসারে চাকরি করেন। পড়াশোনার পাশাপাশি আজিজুল বাবার ক্ষেত-খামার দেখাশোনা করতেন এবং বাড়ির হালের বলদ ও দুধেল গাভীর যত্ন নিতেন।

আজিজুল চট্টগ্রামে গার্মেন্টসে চাকরি করতেন। স্ত্রীকে কলেজে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির বৈরী পরিবেশ বছর না ঘুরতেই সালমার পড়াশোনার সব আগ্রহ শুষে নিয়েছিল। তিনি স্বামীর সঙ্গে চট্টগ্রামে যাওয়ার বায়না ধরলেন। আজিজুলকে অগত্যা রাজি হতে হয়েছিল। ছোট একটি বাসা ভাড়া করে তিনি সালমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। আজিজুল কাজে চলে গেলে একা একা সালমার সময় কাটতে চাইত না। ছোট শিশুদের পড়াতে শুরু করেছিলেন তিনি। এভাবে দু মাস কাটার পর সালমাও একটি গার্মেন্টসে চাকরি নিয়েছিলেন। বেতন পেতেন মাসে ২৮০০ টাকা করে। বেশ ভালোই চলছিল তাদের সংসার। আজিজুল জানালেন, বাড়িতে টাকা পাঠাতে না হলে তিনি এমনকি সহকর্মীদের সঙ্গে মিলে চট্টগ্রামে জমি কেনারও সক্ষমতা অর্জন করেছিলেন তখন। কিন্তু একদিন মালিক যখন গর্বের সঙ্গে তাদের জানিয়েছিল বছরে তার ৭০০ কোটি টাকা লাভ হয়েছে, তখন আজিজুলের মনের মধ্যে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর এক অদম্য স্পৃহা জেগে উঠেছিল। তিনি নিজেকে প্রশ্ন করেছিলেন – আমাদের পরিশ্রমের আয়ে যদি মালিক বছরে ৭০০ কোটি টাকা লাভ করে থাকে তা হলে আমার নিজের পরিশ্রম দিয়ে আমি আমার নিজের ভবিষ্যৎ গড়ছি না কেন? বিষয়টি নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করলেন। নিজেদের শ্রমে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়তে পারলেই সবচেয়ে ভালো হয় – এই উপলব্ধি থেকে তারা অটল সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, গার্মেন্টসের চাকরি ছেড়ে দিয়ে তারা বাড়িতে এসে নিজেরাই কিছু একটা করবেন। তারা করলেনও তাই।

২০১০ সালের ডিসেম্বরে তারা চাকরি ছেড়ে বাড়িতে চলে আসেন। বাড়িতে এসে স্ত্রীকে নিয়ে আজিজুল বাবার বাড়িতেই উঠেছিলেন। চাকরিতে ঢোকার আগে আজিজুল বাবার সংসারের গবাদিপশুর দেখাশোনা করতেন বলে চট্টগ্রাম থেকে ফিরে এসে গাভী পালনের সিদ্ধান্ত নেন, যা সালমা খাতুনেরও খুব মনে ধরে গিয়েছিল। এলাকার অনেকেই গাভী পালন করে লাভবান হচ্ছিল – সেই উদাহরণও আজিজুল ও সালমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। চাকরি ছেড়ে দেয়ার পর আজিজুল ১ লাখ টাকা পেয়েছিলেন। সেই টাকা থেকে বাবার হাতে ৫০ হাজার টাকা তুলে দিয়ে বাকি টাকা থেকে ৪৪ হাজার টাকা দিয়ে একটি দো-আঁশলা জাতের গাভী কিনেছিলেন। সালমা গাভীটিকে গভীর মমতায় লালন-পালন করতেন। আজিজুল বাবার কাছ থেকে ১০ কাঠা জমি চেয়ে নিয়েছিলেন গরুর জন্য নেপিয়ার ঘাস চাষ করবেন বলে। সেই গাভীটি দিনে ৯ লিটার করে দুধ দিত। প্রথম দিকে আজিজুল আলেফ নামের একজন বড় খামারির কাছে এই দুধ বিক্রি করতেন প্রতিলিটার ২৬ টাকা দরে। প্রাণ কোম্পানি তখন দুধ কিনত (এখনও একই দামে কেনে) লিটারপ্রতি ৪২ থেকে ৪৫ টাকা দরে। দুধে ননির পরিমাণের ওপর দাম নির্ভর করে। সাধারণত সকালের দিকে দোয়ানো দুধে ননি কম থাকে এবং বিকেলের দুধে ননি বেশি থাকে। কিন্তু দুধের পরিমাণ অল্প বলে আজিজুল সেখানে যেতে সাহস পেতেন না। অবশেষে সাহস করে তিনি একদিন গুনাইগাছায় প্রাণ কোম্পানির অফিসে গিয়ে বললেন, 'আমার গাভী অল্প পরিমাণ দুধ দেয়, আপনারা কি এতো অল্প

আজিজুল হকের সঙ্গে সালমা খাতুন

দুধ নেবেন?' জবাবে তারা জানিয়েছিল – আধা লিটার দুধ হলেও তারা নেবে। সেই থেকে তিনি প্রাণ কোম্পানিতে দুধ বিক্রি করেন।

বছরখানেক পরে প্রথম গাভীর এঁড়ে বাছুরটি বড় হলে তিনি ৫০ হাজার ৫০০ টাকায় বিক্রি করেছিলেন। এতে তারা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই গাভী পালনে খুব উৎসাহিত হয়ে পড়েন। কিন্তু সেভাবে জাত বিচার না করে ৫৫ হাজার টাকা দিয়ে দ্বিতীয় গাভীটি কিনে লোকসানে পড়েন। ২০ হাজার টাকা লোকসান গুনে সেই গাভীটি তাদের বিক্রি করতে হয়েছিল ৩৫ হাজার টাকায়। এর মধ্যে প্রথম গাভীটি আবার প্রসব করলে তারা আবার মনপ্রাণ ঢেলে সেটির যত্ন নিতে থাকেন। এর মধ্যে তিন ভাই একজোট হয়ে বাবাকে বলেন আজিজুলকে পৃথক করে দিতে। তাদের বাবার ছিল ১০ বিঘা জমি। বাবা অনেকটা বাধ্য হয়ে আজিজুলকে পৃথক করে দেন।

আলাদা সংসার এবং খামারের গোড়াপত্তন: আজিজুল তখন আলাদা বাড়ি করতে চাইলে তার বাবা তাকে পৈলানপুরে ৯ শতকের একটু বেশি জমির এই ভিটেটি দিয়ে দেন। ৪/৫ কেজি চাল ও দুটি রান্নার হাঁড়ি দিয়ে তাদের পৃথক করে দেয়া হয়। তাদের প্রথম সন্তান মো. তৌহিদুল ইসলামকে নিয়ে তারা নতুন বাড়িতে এসে ওঠেন । ২০১৫ সালের ঘটনা এটি। আজিজুল তখন এই ২২ হাত বাই ৮ হাত ইটের দেয়ালের টিনের ঘরটি তুলে এখানে চলে আসেন। গরুর জন্য ১২ হাত বাই ৮ হাত একটি টিনের দোচালা তুলে নেন। ভীষণ কষ্ট করে চলতে হয়েছে তখন তাদের। সে সময় তিন মাসেরও বেশি সময় তারা গুঁড়োমাছও কিনে খেতে পারেননি। এ কথা বলার সময় সালমার চোখ দুটি ভিজে উঠেছিল। এরপর আজিজুল মনে মনে ভাবতে থাকেন এই গাভীর খামারে কী করে সারা বছর দুধ উৎপাদন করা যায়। এক সময় ঠিক করে ফেলেন এনজিও থেকে ঋণ নেবেন। বিভিন্ন এনজিও সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারেন সিদীপ নামের একটি এনজিও থেকে শুধু ঋণই দেয়া হয় না, কৃষি ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দেয়া হয়, এর সদস্যদের স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হয়

এবং শিশুদের লেখাপড়ায়ও তারা সহায়তা করে থাকে। তাই তিনি সিদীপ থেকে ঋণ নিয়েই খামারে পুঁজির ঘাটতি মেটাবেন বলে ঠিক করলেন।

তাদের বাড়ির পাশেই ছিল সিদীপের পৈলানপুর মহিলা সমিতির সভানেত্রী আসমানি বেগমের বাড়ি। আজিজুল সালমাকে তার কাছে পাঠান সিদীপের সমিতিতে ভর্তি হতে। আসমানি এবং সমিতির অন্য সদস্যরা তাকে সদস্য করতে সোৎসাহে রাজি হয়ে যান। ২০১৫ সালের ১৯ আগস্ট সালমা খাতুন এই সমিতির সদস্যপদ লাভ করেন। সমিতির সদস্য হওয়ার পর সভানেত্রীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক সভায় অংশ নেন। সিদীপের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিল্ড অফিসার এ সভায় তাদের ঋণ কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন এবং সিদীপের উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে সমিতি সদস্য এবং তাদের পরিবারের অসুস্থ সদস্যদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দেন। এই সভাতে তিনি ঋণ নেয়ার ইচ্ছের কথা জানালে সমিতির সভানেত্রী আসমানি বেগম সিদীপের বালুচর শাখার ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের কাছে সালমার ঋণ প্রস্তাব সুপারিশ করেন এবং সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। সিদীপের শাখা অফিস থেকে তার ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে ঋণ প্রস্তাব যাচাই-বাছাই শেষে সে মাসেরই ২৭ তারিখ তাকে ৪০,০০০ হাজার টাকা ঋণ দেয়া হয়। সেই ঋণের টাকার সঙ্গে আগের একটি গরু বিক্রির টাকা এবং কিছু জমানো টাকা মিলিয়ে ১ লাখ ৫ হাজার টাকা খরচায় তারা একটি শাহিওয়াল গাভী কেনেন। শাহিওয়াল হচ্ছে জেবু জাতের গরু, যেগুলোকে প্রধানত দুধ উৎপাদনের জন্য পালন করা হয়। জেবু জাতের গরুর মধ্যে শাহিওয়াল গরুই সবচেয়ে বেশি দুধ দেয়। এই গাভীটি থেকে সালমা দিনে ১৬ থেকে ১৮ লিটার দুধ পেতেন। এই সময় তার তিনটি গাভী ছিল। প্রথম গাভীটি ছাড়াও একটি বকনা বাছুর ততোদিনে গাভী হয়ে গিয়েছিল। তবে তিনটি গাভী থেকে এক সঙ্গে দুধ পেতেন না। একটি দুধ দেয়া বন্ধ করলে আরেকটি হয়তো দুধ দিতে শুরু করত। এর পরের বছর, মানে ২০১৬ সালে সিদীপ থেকে দুই দফায় ঋণ নিয়েছিলেন। প্রথম দফায় নিয়েছিলেন ২০ হাজার টাকা এবং দ্বিতীয় দফায় ৬০ হাজার টাকা। এ বছর সালমা ১ লাখ ৩৫ হাজার টাকায় একটি হোলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাতের গাভী কিনেছিলেন। বিশ্বে সবচেয়ে বেশি দুধ দেয় ছোপ ছোপ সাদা-কালো জাতের এই গাভী। এ সময় তিনি গড়ে দিনে ৩২ লিটার করে দুধ পেতেন। ঘাস, দানাদার খাবার ইত্যাদি মিলে দিনে তার খরচ হতো ৯৩০ টাকা এবং দুধ বিক্রি করতেন রোজ ১৩৫০ টাকার, অর্থাৎ রোজ তার লাভ থাকত ৪২০ টাকা।

সালমা তার বকনা বাছুরগুলো রেখে দিতেন এবং এঁড়ে বাছুরগুলো একটু বড় করে বিক্রি করে দিতেন। এর ভেতর তিনি একটি এঁড়ে

গাভী দোয়াচ্ছেন সালমা খাতুন

বাছুর ৯৫ হাজার ৫০০ টাকায় এবং অন্য আরেকটি এঁড়ে বাছুর বিক্রি করেছিলেন ৯১ হাজার টাকায়। আরো কয়েকটি এঁড়ে বাছুর বিক্রি করেছেন তিনি এবং সবকটিই ৫০ হাজার টাকার ওপরে। ২০১৮ সালে দু দফায় ঋণ নিয়েছেন ৪০ হাজার এবং ১৫ হাজার টাকা। ২০১৯ সালে দু দফায় নিয়েছেন ৭০ হাজার এবং ২০ হাজার টাকা। ২০২০ সালে ঋণ নিয়েছিলেন ৩০ হাজার টাকা এবং ২০২১ সালে কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে সিদীপ থেকে তিনি আরআরএসএল ঋণ নিয়েছেন ১ লাখ টাকা। সিদীপ থেকে নেয়া ঋণের সব টাকাই তিনি বিনিয়োগ করেছেন গাভী পালনে। ২০২০ সালে একটি রিক্সাভ্যান কিনেছেন ১৫ হাজার টাকায় – সেটিও গরুর দুধ সরবরাহ এবং গরুর ঘাস বহনে ব্যবহার করেন। তার মানে এটিও গাভী পালন সংক্রান্ত ব্যয়। সর্বশেষ অস্ট্রেলিয়ান জাতের একটি গাভী কিনেছেন তিনি ১ লাখ ১১ হাজার টাকায়।

দুধ সংগ্রহ: সালমা খাতুন তার খামারের গরুর দুধ সংগ্রহের জন্য এখনো কোনো যান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। আমি তাকে দুধ দোয়ানোর মেশিনের কথা বললে তিনি জানালেন, তাদের অবস্থা এখনো সে পর্যায়ে পৌঁছেনি। এখানকার এক বড় খামারি নাকি দুধ দোয়ানোর মেশিন কিনে এনেছিলেন, কিন্তু সে মেশিনে দুধ দোয়াতে পারেননি, কারণ গাভীর ওলানে সে মেশিন লাগানো মাত্র গরু লাফালাফি শুরু করে দেয়। আমি তাকে আর বলতে গেলাম না যে, বাংলাদেশেরই অনেক খামারি এখন মেশিনে দুধ সংগ্রহ করছেন। ব্যাপারটা অভ্যাস এবং দৃষ্টিভঙ্গির। তারা যখন দেখবেন মেশিনে দুধ সংগ্রহ সহজ এবং সময়ও বাঁচে তখন এই সালমারাই এক সময় মেশিনে দুধ সংগ্রহ শুরু করবেন। সে যাই হোক, সালমা খাতুনের দুধ সংগ্রহের তথ্য জানতে গিয়ে এক মজার ঘটনা জানতে পারলাম। আর তা হচ্ছে – প্রথম গাভীটির দুধ দোয়াতেন আজিজুল নিজে। কিন্তু দ্বিতীয় গাভী থেকে শুরু করে পরের কোনো গাভীই আজিজুলকে দুধ দোয়াতে বসতে দেয়নি – লাথি মেরে সরিয়ে দিয়েছে। অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে, সালমা দুধ দোয়াতে বসলেই সেসব গাভী চুপচাপ থাকে, একটুও নড়াচড়া করে না। তাই বাধ্য হয়ে তার পর থেকে সালমাকেই দুধ দোয়াতে হয়। তারা দিনে চারবার দুধ সংগ্রহ করেন এবং এখন সালমাকে ১০টি গাভী দোয়াতে হয়। তার মানে দিনে তাকে ৪০ বার দুধ দোয়াতে হয়। খুব ভোরবেলা একবার এবং সকাল ৯টার দিকে দুধ সংগ্রহ করার পর আজিজুল ভ্যানে করে প্রাণ কোম্পানিতে দিয়ে আসেন। আবার দুপুর ও সন্ধ্যায় আরেক দফা দুধ সংগ্রহ করে প্রাণ কোম্পানির দুধ সংগ্রহ কেন্দ্রে দিয়ে আসেন।

বর্তমান অবস্থা: বর্তমানে তার খামারে মোট ২১টি গরু। এর ভেতরে ১০টি গাভী দুধ দিচ্ছে, বকনা বাছুর আছে ৫টি এবং ৬টি আছে এঁড়ে বাছুর। তিনি এখন দিনে ৮০ থেকে ৯০ লিটার দুধ পান। গাভীর খামার চালাতে গিয়ে এখন তিনি কোনো সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন কিনা – এমন প্রশ্নের জবাবে সালমা বলেন, বিভিন্ন রকমের সমস্যা মোকাবেলা করে এগিয়ে যেতে হচ্ছে তাকে।

নিজেদের বাড়িতে ওঠার পর থেকে তারা দুজনেই ফজরের ওয়াক্ত থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যেমন কঠোর পরিশ্রম করেছেন, তেমনি খুব

দুধ ও ঘাস পরিবহনের ভ্যান

হিসেব করে চলেছেন। গরুর সংখ্যা বাড়লেও কোনো কাজের লোক রাখেননি। কিন্তু গত বছর তার স্বামী ঘাসের আঁটি রাখতে গিয়ে গরুর ঘরের পাকা উঠোনে পড়ে গেলে কনুই ভেঙে ছয় মাস বিছানায় পড়ে ছিলেন। সালমা খাতুনকে তখন বাধ্য হয়ে গরুর ঘাস কাটার জন্য একজন লোক রাখতে হয়েছে। দিনে তাকে ৩০০ টাকা দিতে হয়, বিনিময়ে সে দু বেলা ঘাস কেটে দিয়ে যায়। এরপর এ বছর এপ্রিল মাসে পাবনার কাছাকাছি এক সড়ক দুর্ঘটনায় তার স্বামীর পা ভেঙে গেলে প্রথমে লোকজন তাকে পাবনা হাসপাতালে নিয়ে যায়। একটি জটিল অপারেশন করতে হবে বলে সেখান থেকে তাকে রাজশাহীর ঝাউতলায় আমেনা হাসপাতালে রেফার করা হয়। সফল অপারেশন শেষে ডাক্তার তার স্বামীকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। তবে একুশ দিন ইনজেকশন দেয়ার ব্যবস্থাপত্র দেন। সালমা তখন সিদীপের বালুচর শাখার উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসারকে ফোন করে তার সমস্যার কথা জানান। বাইরের ডাক্তারখানার লোক ডেকে এনে ইনজেকশন দিতে গেলে রোজ তাকে বেশ কিছু টাকা গুনতে হতো। সিদীপের স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির এই কর্মকর্তা পরদিন থেকে ঈদের ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার তোড়জোড় করছিলেন, কিন্তু সালমার ফোন পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছুটে আসেন এবং আজিজুলের হাতে ক্যানোলা লাগিয়ে দেন, যাতে সালমা নিজেই বাকি ইনজেকশনগুলো দিতে পারেন।

কৃষিজমির ব্যবহার: গরুর সংখ্যা বেড়ে যেতে থাকলে ঘাস চাষের জন্য সালমার আরো জায়গার দরকার হয়ে পড়ে। তিনি তখন তার স্বামীকে বলে ২৫ হাজার টাকা দিয়ে আড়াই বিঘা জমি লিজ নেন। সেই জমিতে তিনি নেপিয়ার ও জাম্বু ঘাস চাষ করতে থাকেন। পরে আরো এক বিঘা জমি লিজ নিয়েছেন, তবে এ জমিটুকু বছরে ছয় মাস পানির নিচে থাকে। এই জমিতেও ঘাস চাষ করেন তারা। শ্বশুরবাড়ি থেকে এই বসতভিটেটুকু ছাড়াও বছরখানেক আগে দেড় বিঘা জমি পেয়েছেন। সে জমিতেও মূলত ঘাস চাষ করেন। আজিজুল জমিতে একবারই ধানের আবাদ করেছিলেন এবং সেবার ২৮ মণ ধান পেয়েছিলেন। আসলে তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড এই গরুর খামারকে ঘিরে, তাই জমিতে ঘাস ছাড়া অন্যকিছু আবাদ করলেও সেই আবাদের শস্য ঘরে না তুলে কাঁচা অবস্থায় ক্ষেত থেকে কেটে এনে তা গরুকে খাওয়ান। গম ও খেসারি চাষ করেন মাঝে মাঝে, তবে সেই কচি গম গাছ ও খেসারি গাছ গরুকে খাওয়ান।

বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট: সালমা খাতুন তার খামারের গোবরকে কাজে লাগিয়েছেন খুবই বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে। নিজেদের জমিতে সার হিসেবে ব্যবহারের পাশাপাশি বায়োগ্যাস উৎপাদন করছেন বছর দুয়েক আগে থেকে। ২০১৮ সালে 'সবুজ বাংলা' নামে একটি বায়োগ্যাস অবকাঠামো নির্মাণকারী সংস্থাকে দিয়ে বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছেন ৩৫ হাজার টাকা খরচায়। তিনি এই টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করেছেন। বাড়িতে বায়োগ্যাস থাকায় এখন আর তাকে লাকড়ির চুলা জ্বালাতে হয় না। সালমা জানালেন, বায়োগ্যাস করায় তার খামারের জন্য খুব সুবিধা হয়েছে।

হাঁস-মুরগি-ছাগল: সালমা খাতুন বর্তমানে তার বাড়িতে ৪টি হাঁস, ৬টি মুরগি ও ৬টি ছাগল পুষছেন। ছাগল ৬টির মধ্যে ২টি বড় এবং ৪টি রয়েছে ছাগলছানা। সিদীপের কৃষি ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার পরামর্শে ছাগলের ছোট্ট টিনের চালায় মাচা করে নিয়েছেন। এতে ছাগলের রোগবালাই কম হচ্ছে।

খামারের ব্যবস্থাপনা: সালমা ও আজিজুল অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাদের গরুর খামার পরিচালনা করছেন। খামার শুরু করার পরপরই প্রাণ কোম্পানি থেকে কম খরচে কীভাবে গরুর খামারকে লাভজনক করে তোলা যায় তার ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তারা সেই প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে তাদের খামারটিকে বড় করে তুলছেন। তাদের ভেতরে সালমার রয়েছে দক্ষ পরিচালনার সহজাত গুণ। তার বাবা অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা শক্ত ও দক্ষ হাতে সংসার চালান, তার সেই গুণ সালমাও পেয়েছেন। প্রায় দেড় বছর ধরে অসুস্থতার কারণে তার স্বামী গরুর খামারের কোনো কাজ করতে পারেন না। সালমা এ সময়ে একা একা খামারের সব কাজ শুধু করছেনই না, আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় এটিকে তিনি আরো লাভজনকও করে তুলেছেন।

রোগবালাই দমন: খামারের রোগবালাই দমনে সালমা সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে থাকেন। তিনি বেশ ভালো করেই জানেন একবার রোগবালাই হানা দিলে তার খামারের ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে তিনি বড় বড় খামারিদের অনুসরণ করেন এবং নিজেও সময়মতো যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রাণ কোম্পানির নিবন্ধিত দুগ্ধ খামারি বলে তাদের ভ্যাটেরিনারি ডাক্তার

সালমার বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট

নিয়মিত তার খামার পরিদর্শন করেন এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও ওষুধ দিয়ে যান। তা ছাড়া তিনি নিজেও উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে গিয়ে পরামর্শ নিয়ে আসেন। সিদীপের প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাও নিয়মিত তার খামার পরিদর্শন করে তাকে নানা পরামর্শ দেন।

গরুর ঘর: সালমা খাতুনের এখন দুটি গরুর ঘর। দুটিই টিনের দোচালা। একটির মেঝে পাকা, আরেকটির কাঁচা। প্রথম যখন এ বাড়িতে এসে ওঠেন তখন তার গরুটি একটি খড়ের ঝুপরিতে রাখতেন। শাহিওয়াল গাভীটি কেনার পর ১২ হাত বাই ৮ হাত একটি টিনের দোচালা তুলে নিয়েছিলেন। গরুর সংখ্যা বাড়তে থাকায় ২০১৮ সালে ১ লাখ ৬৫ হাজার টাকা খরচ করে ২৬ হাত বাই ১৫ হাত মাপের এই টিনের দোচালা ঘরটি তুলেছেন তারা। ঘরটির মেঝে পাকা এবং খাবার দেয়ার জায়গা ও পানি রাখার জায়গা পাকা গাঁথুনি দিয়ে বাঁধানো।

স্বামী-সন্তান নিয়ে সালমা খাতুনের পারিবারিক সদস্য ৪ জন। তাদের এক ছেলে এবং এক মেয়ে। ছেলে মো. তৌহিদুল ইসলাম তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে, মেয়ে মোসাম্মৎ তাসলিমা খাতুন এখনো ছোট – স্কুলে যাওয়ার বয়স হয়নি।

সালমা ভবিষ্যতে তার খামারটিকে আরো অনেক বড় করে তুলতে চান। যদিও আজিজুল এখন চাইছেন গরু বিক্রি করে এনজিওসহ সবার দেনা শোধ করে যে কয়টা গরু থাকে তাতেই সুখে সময় কাটাবেন, সালমা তার সঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি তার খামারকে দেশের শীর্ষস্থানীয় একটি খামারে পরিণত করতে চান। দৃঢ় কণ্ঠে সালমা খাতুন জানালেন, বিয়ের আগে বাবার সংসারে কোণঠাসা হয়ে থাকতে হয়েছে, বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে গঞ্জনা সইতে হয়েছে; এখন এই গরুর খামার করে তার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে তিনি এটিকে অনেক অনেক বড় করে সবাইকে দেখিয়ে দিতে চান তার সামর্থ্য কতোখানি! তিনি নিজে অনেক কষ্ট করেছেন, কিন্তু নিজের সন্তানদের জন্য এক সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ে দিয়ে যেতে চান। এ সময় স্বামীর দিকে তাকিয়ে মৃদু কটাক্ষ করে বললেন, 'আমার স্বামী কাজকে এখন ভয় পান, কিন্তু আমি কোনো ভয় পাই না। এখন দশটি গরু দোয়াই, দরকার হলে আরো একশোটা গরুর দুধ দোয়াবো। আমি এই গাভীর খামারের শেষ দেখে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।'

দেশের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে উন্নয়নের চাকাকে যারা সামনে ঠেলে নিয়ে চলেছেন তাদেরই একজন দৃঢ় ও সাবলীল সালমা খাতুনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন পথে নামলাম তখন চারদিক অন্ধকার নেমে এসেছিল, কিন্তু আমাদের সামনে ধ্রুবতারার মতো জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল সালমার দু চোখে ফুটে ওঠা আশার আলো। ■

লেখক:
মনজুর শামস: গবেষণা ও ডকুমেন্টেশন কর্মকর্তা, সিদীপ;
প্রতাপ চন্দ্র রায়: কৃষি কর্মকর্তা, সিদীপ;
মো. জাহিদ হাসান: উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তা, সিদীপ

শরতের মোহনায়

তিতাস নদীর দুই ধার
কাশফুলে সাদা নদীর এপার ওপার
আকাশেতে উড়ে শঙ্খচিল
নদীতে খেলা করে অসংখ্য গাঙচিল
আর আছে সেখানে বালিহাঁসের আনাগোনা
সেখানে নাকি শরতের আসতে মানা!
নদীতে পড়েছে কাশফুল আর
শালিকের ঝাঁক
এসে গেছে, এসে গেছে
শরতের ডাক।
নদীর ওপারে ছোট ছোট বালকেরা উড়ায়
নানা রঙের ঘুড়ি
তখন দীঘল কালো এলো কেশে
দেখা যায় বালিকাদের ছড়াছড়ি
কোনো এক দখিনা বাতায়ন
নিয়ে আসে শরতের আগমন
এসে গেছে, এসে গেছে
শরতের শরৎক্ষণ
শান্ত নদীর দুই ধার
বৈঠা হাতে নৌকা নিয়ে
মাঝিরা করে এপার ওপার
রাতের আকাশের ভরা জোছনায়
নদীর পানি করে চিকচিক
শরতের মোহনায়।

গোধূলি লগ্ন

উড়েছে মন
দেখছে ঘুরে ঘুরে দূরের ঐ সুনীল
আকাশ আর দিগন্তের পাহাড় বন।
দুচোখ ভরে, দেখছি ঘুরে
নিঝুম সবুজ দ্বীপে
নীল লাল প্রজাপতিরাও উড়ে
নীল আকাশে লাল সূর্যের ইশারা করেছে সন্ধ্যা
সুন্দর এই গোধূলিতে কি জানি কি
ভেবে যায় মনটা।
পাখিগুলো নীড়ে ফিরে চলছে
আর মিষ্টি কণ্ঠের গানে গানে
রঙীন স্বপ্নগুলোর কথা বলছে।
ভাবছি বসে এখানেই থাকব
ফিরে যেতে মন না চাইছে
সাগর পানে চেয়ে দেখি
সন্ধ্যার এই গোধূলি লগ্ন
ধন্য আমি ধন্য
হয়ে এই দেশে জন্ম।

তাহমিনা আক্তার ঝুমা
শিক্ষিকা, রতনপুর ব্রাঞ্চ, সিদীপ

বাংলা নববর্ষ বাঙ্গালির উৎসব

রিয়াজ মাহমুদ

বাংলা নববর্ষ বাঙ্গালি সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান উৎসব। সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয় বাংলা নববর্ষ। নববর্ষ উদযাপনে বেশি গুরুত্ব পায় আমরা সবাই বাঙ্গালি। ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয়তাবাদের ধারণাকে পাল্টে দিয়ে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটালো। তারই ধারাবাহিকতায় ছায়ানট প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৩ সালে। তার পরের বছরই ঢাকা শহরের মধ্যমণি রমনার বটমূলে 'ছায়ানট' ভোর ছয়টায় নববর্ষের অনুষ্ঠানের সূচনা করে। সারা দেশে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে এ দিবস পালিত হয়।

নববর্ষ উদযাপনের প্রচলন শুরু হয় মধ্যপ্রাচ্য থেকে। ইরানে নববর্ষের প্রথম দিন হলো নওরোজ। ইরান, তুরস্ক, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান ও আফগানিস্তানসহ পৃথিবীর নানা জায়গায় নওরোজ পালন হয়। গত ৩০০০ বছর ধরে পশ্চিম এশিয়া, মধ্য এশিয়া, ককেশাস, ব্ল্যাকসি উপত্যকা এবং বলকানে নওরোজ পালিত হয়ে আসছে। প্রতিবছর ২১ মার্চ বা তার একদিন আগে/পরে নওরোজ পালিত হয়। প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপিয়ানরা তাদের দিনপঞ্জির প্রথম দিনটিতে ভোজ অনুষ্ঠান উদযাপন করতো কি-না তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায় শরৎকাল এবং বসন্তকাল দুটোই প্রাচীন ইরানীরা শস্য কাটা এবং বীজবপনের সূত্রে পালন করতেন। এভাবেই গড়ে উঠেছিল নববর্ষ পালনের রীতি। ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে ইরানে মুসলিম বিজয়ের পরও নওরোজ উদযাপন বন্ধ করা হয়নি। প্রাচীন আব্বাসীয় যুগেও নওরোজকে প্রধান রাজকীয় পার্বণ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বিখ্যাত কবি ওমর খৈয়ামকে উৎসর্গ করা নওরোজনামা বা নববর্ষ গ্রন্থ বইটিতে নওরোজ পালনের জ্বলজ্বলে ছবি আঁকা হয়। খেলাফতের সময়ও নওরোজ পালন করা হতো।

বাংলা দিনপঞ্জি নিয়ে আছে কিছু মতবিরোধ। তবে ইতিহাসের দিকে তাকালেই দেখা যায় ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে ১২ বা ১৪ এপ্রিল গৌড়ের নৃপতি শশাঙ্ক প্রথম 'বঙ্গাব্দ' শুরু করেন। সংস্কৃত জ্যোতির্বিজ্ঞানগ্রন্থ 'সূর্য সিদ্ধান্ত'র উপর ভিত্তি করে এই সাল গণনা শুরু হয়। অনেকে এই মতের সাথে দ্বিমত করে বলেন আলাউদ্দিন হোসাইন শাহ্ (১৪৯৪-১৫১৯) বাংলা ও আসাম অঞ্চলে প্রচলিত সৌরক্যালেন্ডারের সাথে ইসলামী চান্দ্র ক্যালেন্ডার যুক্ত করে নতুন বাংলা ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করেন।

এই দুই মত নিয়ে মতপার্থক্য থাকলেও মুঘল সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫) খাজনা আদায় সহজতর করার জন্য বর্তমান বাংলা ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করেন। সে সময় এই ক্যালেন্ডারকে বলা হত 'তারিখ-ই-ইলাহি'। ইসলামী চান্দ্র ক্যালেন্ডারের সাথে এখানকার সৌর ক্যালেন্ডারের বড় রকমের পার্থক্য ছিল। যার ফলে স্থানীয় কৃষকদের সাথে খাজনা ও ফসল কাটা নিয়ে নানা জটিলতা সৃষ্টি হত। এই সংকট নিরসনকল্পে আকবরের নির্দেশে তার অর্থমন্ত্রী টোডর মল ক্যালেন্ডার সংস্কারের উদ্যোগ নেন। পরবর্তীতে আকবরের রাজসভার জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফতুল্লা সিরাজির উদ্যোগে পুনরায় ইসলামী চান্দ্র মাসের বদলে সৌর ও চান্দ্র বর্ষের মিলন মুহূর্তে নতুন ক্যালেন্ডারে বর্ষ গণনা শুরু হয়। যার নাম দেওয়া হয় 'ফসলীসন'। ৯৬৩ হিজরি সালে (১৫৫৬

খ্রিস্টাব্দ) মহররম বাংলা ক্যালেন্ডারের বৈশাখের সাথে এক হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে বৈশাখ বাংলা ক্যালেন্ডারের প্রথম মাস হিসেবে বিবেচিত হতে শুরু করে। তারিখ-ই-ইলাহি পঞ্জিকায় প্রতিটি মাসের আলাদা আলাদা নাম ছিল। যা আজকের নাম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলে প্রতি রবিবার থেকে সপ্তাহ গণনা শুরু হত। চৈত্রের শেষ দিন নাগাদ মালিকের সব হিসাব-নিকাশ পরিশোধ করতে হত। তার পরের দিন পহেলা বৈশাখ চালু হয়। সে বিষয়ে আজ কোন দ্বিমত নেই। অন্য দিকে 'সূর্য সিদ্ধান্তে' পঞ্জিকা থেকে নক্ষত্রগুলোর নাম নেওয়া হয় এবং বাংলা বারো মাসের নাম ঠিক করা হয়। সেখানে বিশাখা নক্ষত্রের নামে বৈশাখ, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের নামে জ্যৈষ্ঠ, উত্তরাষঢ়ার নামে আষাঢ়, শ্রাবণার নামে শ্রাবণ, পূর্বভাদ্রপদের নামে ভাদ্র, আশ্বিনীর নামে আশ্বিন ইত্যাদি।

১৯৮৬ সালে মঙ্গল শোভাযাত্রার সূচনা হয়, তখন এর নাম ছিল আনন্দ শোভাযাত্রা। যদিও এটি প্রথম শুরু হয় ১৯৮৫ সালে যশোরে। চারুপীঠ নামক একটি সংস্থা প্রথম উদ্যোগ নেয়। মঙ্গল শোভাযাত্রার বৈশিষ্ট্য হল – বাংলার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর হাজার বছরের লোকসংস্কৃতি ও জীব-বৈচিত্র্যের নিদর্শন উপস্থাপন করা। ইউনেস্কো ২০১৬ সালে মঙ্গল শোভাযাত্রাকে 'অমূল্য ভাবসম্পদ ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের উত্তরাধিকার' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। কারণ এখনো লক্ষ্মীপেঁচা শিমুলের ডালে বসে ডাকাডাকি করে। এক সময়ে আমাদের এখানে হাতির পাল ছিল। কথিত আছে আজকের যে পিলখানা সেখানে জমিদারের হাতি থাকতো। হাতিকে যেখানে গোসল করানো হত সেটা আজকের হাতিরঝিল। হাতির গোসল শেষে যেখানে বেঁধে রাখা হত সেটা হাতিরপুল। আর হাতি যে পথ দিয়ে যেত সেটা এলিফ্যান্ট রোড। পুকুরে হাঁস চরে বেড়ায়। কুলার ব্যবহার গ্রামীণ জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ধান-চাল ঝাড় দিয়ে আলাদা করতে কুলার বিকল্প ছিল না। ময়ূরের পালক শিশুরা বইয়ের ভিতরে রাখতো তার চোখধাঁধানো রূপে মুগ্ধ হয়ে। ঘোড়া ও ঘোড়ার গাড়ির ব্যবহার আমাদের ঐতিহ্যের অংশ। আর মস্তবড় অজগর নিয়ে বাঙ্গালির কৌতূহল এখনো বিদ্যমান। এই বিষয়গুলোই মঙ্গল শোভাযাত্রাকে শোভামণ্ডিত করে। এখানে অতীত-ঐতিহ্য বাঁচানো ও সংরক্ষণ করার লক্ষ্য প্রধান।

বাংলা নববর্ষ উদযাপন আমাদের পূর্বপুরুষদের সংগ্রামের ফসল, আমাদের সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেখানে সব মানুষ এক কাতারে এসে দাঁড়ায়। ■

লেখক: কবি ও কলামিস্ট

ইতিবাচক সংস্কৃতি

মো: আমিনুল ইসলাম

ডেপুটি ম্যানেজার এন্ড হেড অব অডিট, সিদীপ

শিখেছি ইতিবাচক সংস্কৃতি
করেছে মোরে অনুপ্রাণিত
দেখেছি আমি শিখিবে সকলে
অফিস ও বাড়ি
ইতিবাচক সংস্কৃতি।
দৃষ্টিভঙ্গি হবে পরিবর্তন
আচার ও কৃষ্টি ছড়িয়ে যাবে
ভরিয়ে দিবে এ মহালয়।
কোন গাড়ি না চড়ে
ঘুরে বেড়াবে সকলের তরে
তিনি-ই তো মহান।
যে-ই দিল এ শিক্ষা
করিল মোরে কৃতার্থ
রহিল প্রত্যাশা
এ দ্বার থাকিবে অবারিত
সকলের তরে।

পরিবর্তন

মনসুর আলম মিন্টু

ফিল্ড অফিসার, জামশা ব্রাঞ্চ, সিদীপ

বদলে যায় না পৃথিবী কভু
বদলে যায় মানুষ
ভুল স্বপ্ন দেখো না কভু
থাকতে তোমার হুঁশ।
পূর্ণিমা রাতের স্বপ্ন দেখিয়ে
আঁধার আনবে ডেকে
তার স্বার্থ বুঝে নিয়ে
তোমায় যাবে রেখে।
যদিও দেখো আদমরূপী
অঙ্গ সবি আছে
বিবেক নামের পাঠশালা
তাদের কাছে নাই যে।
মাটি, বাতাস পৃথিবীটা
অমনি রয়ে আছে
বিধাতার তৈরি মানুষগুলো
পরিবর্তন হয়ে গেছে।

জাতির পিতা

মাহ্‌ফুজ সালাম

বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা
স্বাধীন স্বদেশ ভূমি
সব কিছুতেই তুমি।

তোমার ৭ মার্চের জ্বালাময়ী
বজ্রকণ্ঠ ভাষণ,
কেঁপে ওঠে ইয়াহিয়ার
হৃদয় সিংহাসন।

তোমার ডাকে মুক্তিযুদ্ধে
ঝাঁপিয়ে পড়ে সবে
দীর্ঘ ন'মাস রক্তক্ষয়ী
যুদ্ধ করে তবে।

বীর বাঙালি অস্ত্র ধরে
ছিন্ন করে গ্লানি
রক্ত দিয়ে মুক্ত করে
প্রাণের স্বদেশখানি।

মুক্তিযুদ্ধের রক্ত বেয়ে
তোমার কবর পাশে
স্বাধীনতার রক্ত রবি
এই দেশেতে হাসে।

তোমার রক্তে সিক্ত করে
স্বাধীন স্বদেশ ভুমি
ঘুমিয়ে আছো টুঙ্গি পাড়ায়
দাও সে মাটি চুমি।

বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা
স্বাধীন স্বদেশ ভূমি
সব কিছুতেই তুমি।

পদ্মা সেতু

ডা. তোফাজ্জল হোসেন তারা

সব বাধা আজ পেরিয়ে
মনটা গেল জুড়িয়ে
ট্রেনটা গেল উড়িয়ে
পদ্মা সেতু দিয়ে।

ট্রেনটা যখন টগবগিয়ে
সেতুর উপর ওঠে
দৃশ্য দেখে মন ভরে যায়
দ্বিতল সেতু দেখে।

দিগন্তে ঐ সাগর পানে
ট্রেনটা উড়ে যায়
আকাশচুম্বী গগন যেন
সাগর পানে ধায়

ধুধু সাগর আবছা আলোয়
সাগর দিলাম পাড়ি
কুলকিনারা নাইরে দেখো
নাইরে তাহার তরী।

নদীর মাঝে শীতল হাওয়া
লাগলো যখন গায়
আত্মহারা উষ্ণ আবেগ
আনন্দে জড়ায়।

তোমার রক্তে সিক্ত করে
স্বাধীন স্বদেশ ভুমি
ঘুমিয়ে আছো টুঙ্গি পাড়ায়
দাও সে মাটি চুমি।

পড়ন্ত বেলায় সূর্য যখন
সোনালী আভা রঙ ছড়ায়
মেঘলা আকাশ রঙধনু তার
মনের মাঝে রঙ জড়ায়।

দৃশ্য দেখি ভোরের সূর্য
দৃশ্য দেখি তার
দৃশ্য দেখি শ্যামল প্রান্তর
দৃশ্য ডুবো চর।

বাংলায় এই নদীর মাঝে
ট্রেন চলেছে ঐ
আমরা যাব টুঙ্গীপাড়ায়
তোমরা যাবে কই।

কত কুটচাল কত বঞ্চনা
কত বিপত্তি অহেতু
ষোলকোটি মানুষের সম্পদ আজ
আমাদের পদ্মা সেতু।

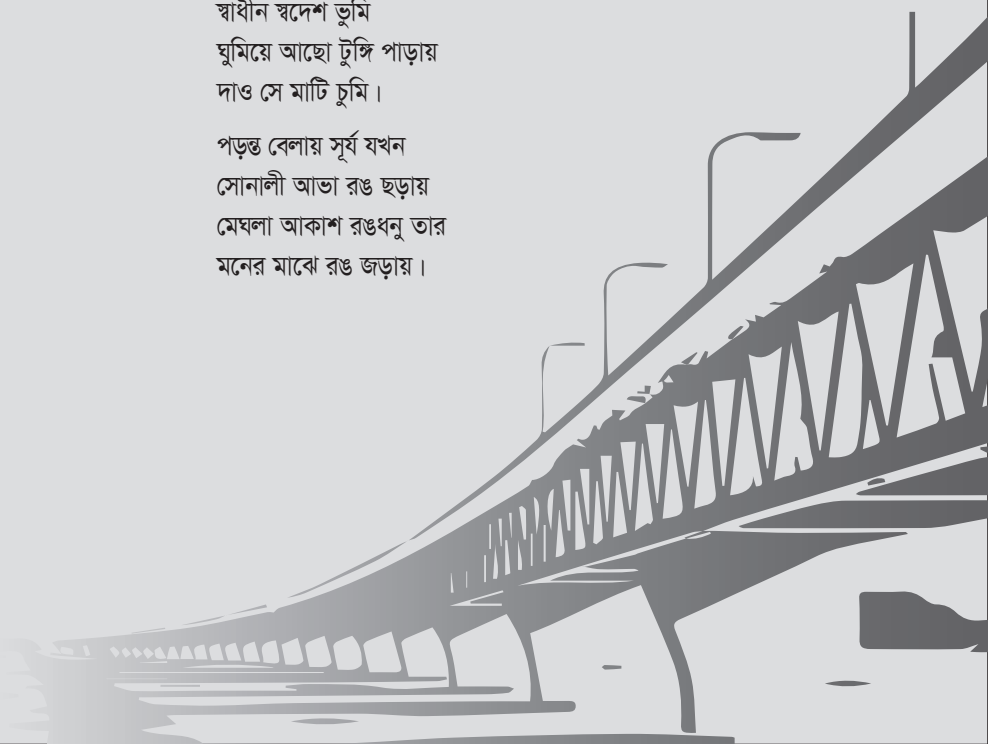

লেখকের সাথে আড্ডা ও জীবনানন্দ পাঠ

সম্প্রতি লেখক-সাংবাদিক আমীন আল রশীদের 'জীবনানন্দের মানচিত্র' বইটি 'কালি ও কলম পুরস্কার' পাওয়া উপলক্ষে ১১ মার্চ সন্ধ্যায় সিদীপের সেমিনার কক্ষে 'শিক্ষালোক' ও 'প্রতিকথা'র যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো 'লেখকের সাথে আড্ডা ও জীবনানন্দ পাঠ'। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা লেখক তাপস বড়ুয়া।

অনুষ্ঠানটি জীবনানন্দ দাশ, তার কবিতা ও পুরস্কার-প্রাপ্ত বইটি নিয়ে আমীন আল রশীদ ও তাপস বড়ুয়ার কথোপকথন, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা ও কবিতা পাঠে ভরপুর ছিল। উপস্থিত ছিলেন সিরাজুদ দাহার খান, শিশির মল্লিক, খান মো. রবিউল আলম, সামস উল আলম মিঠু, আরিফ হোসেন, বাসন্তী সাহা, নাজনীন সাথী, মিঠুন দেব, রিয়াজ মাহমুদ, অনার্য নাঈম, মো. রিয়াজ উদ্দিন খান, মুস্তাফিজ জুয়েল, সুষমা সাহা, খালেদা আক্তার লাবণী, রুমানা তাসমিন শান্তা, আবদুল ওয়াদুদ, নাঈম মুনীর, রেজাউল হক শামীম, জেসমিন বন্যা, উম্মে সুলাইমা ইতু, গাজী মুনির উদ্দিন, অবিয়াদ আমীন হেরা, আলমগীর খানসহ আরও অনেকে।

প্রধান কার্যালয়ে সিদীপ ক্রিকেট টিমের বিজয় উদযাপন

১৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকার পূর্বাচলে একটি পেশাদার ক্রিকেট দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সিদীপের ক্রিকেট টিম জয়লাভ করে

কোভিড-১৯এর প্রাক্কালে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে
প্রবীণ-জীবনের সমস্যা

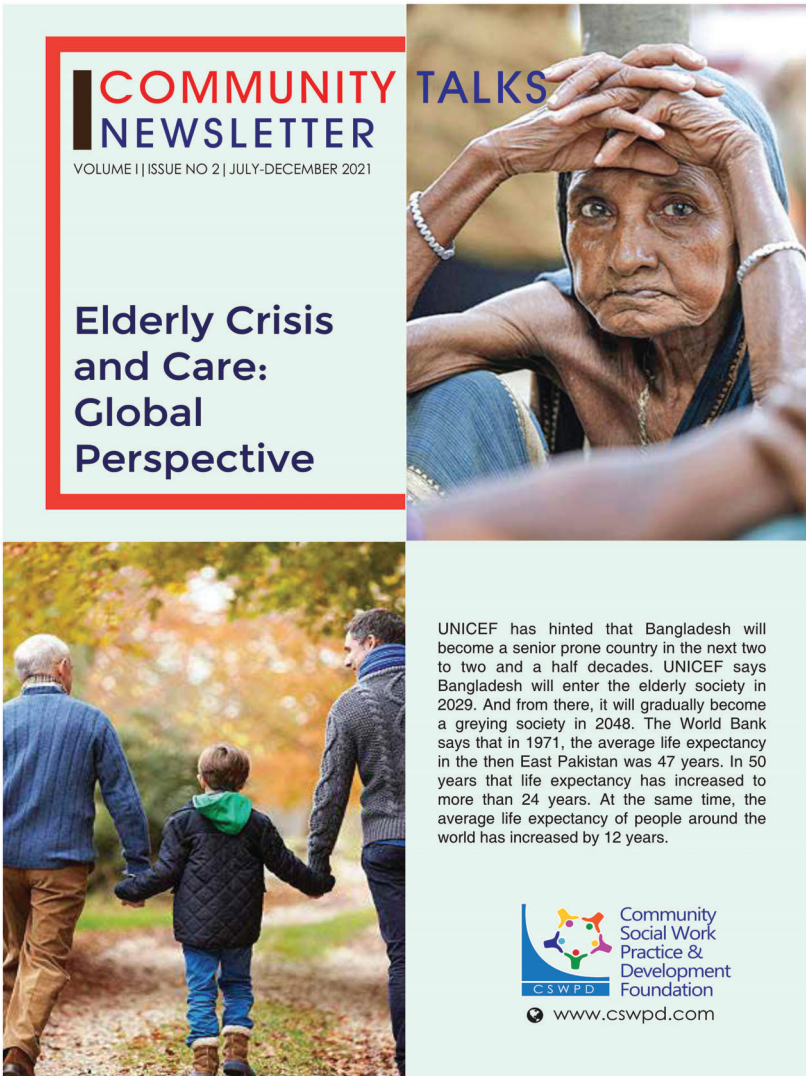

প্রবীণ-জীবনের সমস্যা সব দেশেই ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। উন্নত দেশগুলোতে চিকিৎসা-ব্যবস্থায় নতুন নতুন আবিষ্কার ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার কারণে মানুষ দীর্ঘদিন কর্মক্ষম থাকতে পারে। অর্থাৎ যৌবনের সীমানা বেড়েছে ও বাড়ছে। সেইসঙ্গে প্রবীণ হওয়ার পর যখন সে কর্মক্ষমতাহীন হয়ে পড়ছে, তারপরও দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারে, অর্থাৎ প্রবীণের বয়সসীমাও বাড়ছে। অন্যদিকে জন্মহার কমে যাওয়ার কারণে তারা ভয় পাচ্ছে আগামীতে ক্রমবর্ধমান এই প্রবীণ জনগোষ্ঠীর ভার তাদের অর্থনীতি কতটা বহন করতে পারবে। প্রবীণ-জীবনের সংকট সমাধানের জন্য নানারকম সামাজিক-রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাও তৈরি হয়েছে সেখানে। গড়ে উঠেছে এ বিষয়ক জ্ঞানচর্চা ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। কারণ নিছক পারিবারিক উদ্যোগে এসব সমস্যার সব দিক সামাল দেয়া সম্ভব নয়।

অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই প্রবীণ-সমস্যা অনেকটাই কম। তার প্রথম কারণ এই যে, আমাদের অন্ধত্বের ফলে সমস্যাটা না দেখার একটা সুবিধা আছে! তবে এখনও এখানকার পারিবারিক ব্যবস্থায় প্রবীণ-প্রবীণাদেরকে দেখভাল করার একটা সামাজিক প্রথা বিদ্যমান আছে। যদিও এ প্রথা দিনকে দিন ভেঙে যাচ্ছে। আর পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যেভাবে প্রত্যেক মানুষকে অর্থনৈতিক চাকার স্ক্রু হিসেবে ব্যবহার করছে তাতে কারও পক্ষে আয়-রোজগারের জন্য সংগ্রামের পর পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য পর্যাপ্ত সময় দেয়া সম্ভব হয় না। প্রবীণ-প্রবীণাদের জীবন তাই এসব দেশে ক্রমে দুঃসহ হয়ে উঠছে।

এরই সঙ্গে গত দুই বছর ছিল বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসের আক্রমণ। যে আক্রমণে উন্নত, উন্নয়নশীল কি অনুন্নত সব দেশেই প্রবীণ-প্রবীণার জীবন হয়ে উঠেছে আরও অসহায় ও দুর্বিসহ। বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি ঢাকা থেকে 'কমিউনিটি টকস নিউজলেটার' নামে ইংরেজিতে একটি জার্নাল প্রকাশিত হয়েছে যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অধ্যাপক, সমাজকর্মী ও গবেষকদের লেখায় বৈচিত্র্যময় চিত্র ও সমাধানের পরামর্শ উঠে এসেছে। এটি প্রকাশ করেছে সিএসডব্লিউপিডি (Community Social Work Practice & Development) ফাউন্ডেশন। এটি যৌথভাবে সম্পাদনা করেছেন ঢাকার দা পিপল'স ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম বিভাগের চেয়ারম্যান ও সহযোগী অধ্যাপক

সমাজকর্মী মো. হাবিবুর রহমান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার Daegu Association of Social Workers-এর সভাপতি Sug Pyo Kim।

কোভিড-১৯এর প্রাক্কালে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বার্ধক্য ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সমস্যা নিয়ে প্রকাশিত জার্নালটির সাদামাটা প্রচ্ছদে ছাপা হয়েছে ইউনিসেফের একটি ভবিষ্যদ্বাণী: 'বাংলাদেশ প্রবীণসমাজে প্রবেশ করবে ২০২৯ সালে। আর সেখান থেকে ধীরে ধীরে একটি সাদাচুলের সমাজে পরিণত হবে ২০৪৮ সালে।' আমরা যারা এখনও বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভাবছি না ও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করছি না, এই সতর্কবাণীটি হয়তো তাদেরকে নাড়া দিতে সক্ষম হবে।

জার্নালটির দক্ষিণ কোরিয়ান সম্পাদক Sug Pyo Kim বাস করেন দ্বিতীয় উহান বলে পরিচিত ডেগু শহরে। তিনি এখানকার হাসপাতালগুলোয় সমাজকর্মীরা এ সময়ে কিভাবে প্রবীণ-প্রবীণাদের সেবা দিয়েছেন সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সমস্যা মোকাবিলায় পাবলিক-প্রাইভেট অংশীদারিত্ব এ ক্ষেত্রে ভাল ফল দিয়েছে বলে তিনি মনে করেন। তিনি লিখেছেন যে কোভিড প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মৌলিক মানবাধিকারকে সংকুচিত ও খর্ব করে। লিখেছেন, "কোভিড-১৯ তাদের স্বাধীন ইচ্ছা কেড়ে নিয়েছে। তারা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে পারে না এবং বাইরে যেতে পারে না। আমি মনে করি যে প্রবীণদের মানবাধিকারকে ভবিষ্যতে আরও গভীরভাবে দেখা উচিৎ।"

প্রবীণ-জীবনের সমস্যা অনেক গভীর ও জটিল, যা আমাদের ভাবনার বাইরে। ঢাকার রয়াল ইউনিভার্সিটির নৃতত্ত্ব ও সমাজকর্মের শিক্ষক ও উপদেষ্টা ড. প্রফুল্ল সি. সরকার তার প্রবন্ধে দেশের প্রেক্ষাপটে লিখেছেন, "১৯১১ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ... ষাট বছর ও তার উর্ধ্বে বয়স্ক লোকের সংখ্যা ১৪ লাখ থেকে ৬১ লাখে পৌঁছেছে এবং ১৯৯১ সালে তারা ছিলেন জনসংখ্যার প্রায় ৫.৪ শতাংশ। ২০১৯ সালে বাংলাদেশে ১ কোটি ৩০ লাখের বেশি মানুষ ৬০ বছরের উর্ধ্বে যারা মোট জনসংখ্যার ৮ শতাংশ। যদি বৃদ্ধির এই হার অব্যাহত থাকে, ২০৫০ সাল নাগাদ ষাটোর্ধ্ব লোকের সংখ্যা ৩ কোটি ৬০ লাখ ও মোট জনসংখ্যার ২১.৯ শতাংশ হবে বলে অনুমান করা যায়।"

বয়স্কভাতার পরিমাণ পর্যাপ্ত হতে হবে যাতে তারা স্বাধীনভাবে চলতে পারে। উপযুক্ত হাসপাতাল তৈরি করতে হবে যাতে বয়স্করা কম মূল্যে মানসম্মত চিকিৎসা পান। সরকারি হাসপাতালগুলোয় তাদের পৃথক শয্যা থাকতে হবে। তাদের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ঔষধ বিনামূল্যে বা কম মূল্যে দিতে হবে। বড় বড় হাসপাতালগুলোতে তাদের চিকিৎসার জন্য বিশেষায়িত বিভাগ খুলতে হবে।

বাংলাদেশে প্রবীণ-জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য মো. হাবিবুর রহমানের সুপারিশসমূহ হলো: "বয়স্কভাতার পরিমাণ পর্যাপ্ত হতে হবে যাতে তারা স্বাধীনভাবে চলতে পারে। উপযুক্ত হাসপাতাল তৈরি করতে হবে যাতে বয়স্করা কম মূল্যে মানসম্মত চিকিৎসা পান। সরকারি হাসপাতালগুলোয় তাদের পৃথক শয্যা থাকতে হবে। তাদের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ঔষধ বিনামূল্যে বা কম মূল্যে দিতে হবে। বড় বড় হাসপাতালগুলোতে তাদের চিকিৎসার জন্য বিশেষায়িত বিভাগ খুলতে হবে। বয়স্কদের নিয়মিত পরীক্ষ-নিরীক্ষার জন্য পরিবারের সদস্যদেরকে সচেতন হতে হবে। বিভিন্ন পারিবারিক, সামাজিক ও এমনকি রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদিতে বয়স্ক ব্যক্তিদেরকে নিমন্ত্রণ করতে হবে যাতে তারা নিজেদেরকে অপাংক্তেয় ও অন্যের বোঝা মনে না করেন।"

কমিউনিটি টকস নিউজলেটারের এই বিশেষ সংখ্যায় গ্রিস, আর্জেন্টিনা, থাইল্যান্ড, মিশর, জাপান, নেপাল, নাইজেরিয়া, মালয়েশিয়া, সিয়েরা লিওন, শ্রীলংকা, ইউক্রেন, ফিলিপাইন, যুক্তরাজ্য, ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন লেখক-গবেষকের লেখা আছে। ফলে এই সাময়িকীটি থেকে সত্যিকারভাবেই প্রবীণ-জীবনের সমস্যার একটা বৈশ্বিক চিত্র পাওয়া যায়। আবার বিষয়টিকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সুযোগ পাওয়া যায়। এরফলে প্রবীণ-জীবনের সমস্যাকে যথার্থ গভীর মনোযোগের সঙ্গেও দেখা সম্ভব হয়।

এই বৈচিত্র্যময় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার মধ্য দিয়ে প্রবীণ-জীবনের সমস্যার একটা সাধারণ চিত্রও ফুটে উঠেছে। যাতে বিশ্বব্যাপী এই সমস্যার অনেকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়। কিন্তু অবশ্যই এর সমাধান হতে হবে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নিজস্ব উপায়ে।

বাংলাদেশে সমস্যাটি আরও গভীর ও জটিল হয়ে ওঠার পূর্বেই নীতি-নির্ধারকগণকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে আমাদের জাতীয় জীবনের হাজারটা সমস্যার সঙ্গে এটিও যুক্ত হবে যার সমাধান সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কঠিন থেকে কঠিনতর হতে থাকবে।
– আলমগীর খান ■

প্রতিদিন প্রতিক্ষণ

শিশির মল্লিক

গ্রন্থ: প্রতিদিন প্রতিক্ষণ ■ **লেখক:** শংকর দাশ ■ **প্রকাশক:** লেখমালা
প্রচ্ছদ: নাসিম আহমেদ ■ **প্রকাশকাল:** ২০১৩

‘প্রাণিকুলে মানুষকেই শুধু মানুষ হতে হয়। কিন্তু মানুষ যাতে মানুষ না হয়ে ওঠে তার জন্যই আজ সারা পৃথিবীতে তোড়জোড় যেন বেশি। আজ মানুষ দেখাই যাচ্ছে না। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, উঁচু, নিচু, শ্বেতাঙ্গ, নিগ্রো, ক্যাথলিক, প্রোটেস্টান্ট ইত্যাদি পরিচয় মানুষ বিশেষ্যটিকে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলেছে।’

বইটির বিভিন্ন লেখাগুলিকে কয়েকটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায়। যেমন – শিক্ষাবিষয়ক, ভাষা ও সংস্কৃতি, সমাজ ও রাজনীতি, বিজ্ঞান ও মুক্তচিন্তা, নৈতিক অবক্ষয় ও সামাজিক বিভিন্ন প্রসঙ্গ। আমাদের আলোচনাটি শিক্ষা প্রসঙ্গে।

প্রায় আটটি লেখা রয়েছে শিক্ষা বিষয়ে। লেখাগুলো হলো – শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে কলেজ শিক্ষকের ভূমিকা (পৃষ্ঠা-৯), জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী ও আমাদের প্রত্যাশা (পৃষ্ঠা-৫০), প্রকৃত শিক্ষার স্বরূপসন্ধানে (পৃষ্ঠা-৫৬), বিদ্যালয়ে বিদ্যা নেই (পৃষ্ঠা-৭৫), স্কুলকলেজে লেখাপড়া বনাম প্রাইভেট টিউশন (পৃষ্ঠা-৯৫), শিশুরাও শিক্ষক হতে পারে (পৃষ্ঠা-১৫৫), আলোকিত মানুষ গঠনে শিক্ষকের ভূমিকা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ (পৃষ্ঠা-১৫৬), সমন্বিত শিক্ষা ও সংস্কৃতি: প্রাসঙ্গিক ভাবনা (পৃষ্ঠা-১৫৯)।

শুরুর ‘শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে কলেজ শিক্ষকের ভূমিকা’ প্রবন্ধটি লেখক শুরু করেছেন এভাবে, ‘এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বাংলাদেশে সামগ্রিক শিক্ষার মান ক্রমান্বয়ে নিম্নমুখী হচ্ছে। বিশেষত গ্রামবাংলায় স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত মান পূর্বের মতো নেই। ‘পূর্বের’ বলতে আমি ইংরেজ শাসনামল এবং পাকিস্তান শাসনামলের কথা বলছি। ৭১এর মহান মুক্তিযুদ্ধ আমাদের যে হিরন্ময় স্বপ্ন দেখিয়েছিল, তা নিশ্চয়ই উন্নততর শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার বিষয়টিকে বাদ দিয়ে নয়। আজকের এই পরিস্থিতির অন্যতম কারণ বোধ করি শিক্ষিত ও সচ্ছল ব্যক্তিবর্গের শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা। তাছাড়াও রয়েছে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অন্যবিধ আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন।’

শিক্ষাবিষয়ক দ্বিতীয় প্রবন্ধ ‘জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী ও আমাদের প্রত্যাশা’। এতে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়ার

তাগিদ দিয়েছেন। এটিতে তিনি দেশের শত্রু ও মিত্রের পার্থক্য টেনেছেন এভাবে – 'আমাদের দেশের যারা ক্ষতি করছে বা করেছে বা করবে তারা তো অশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ নয়। দুর্নীতির মামলা যাদের বিরুদ্ধে হচ্ছে বা হয়েছে তারা তো রাষ্ট্রের বড় বড় রাঘব বোয়াল। শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষেরা কখনোই রাষ্ট্রের স্বার্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে না। শ্রমজীবী মানুষেরা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে জীবন নির্বাহ করে।'

তারপর বলছেন – 'ভালো ছাত্ররাই তো হবে ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, বিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, আইনবিদ, রাজনীতিক, প্রশাসক। কিন্তু তারা যদি শেষ নাগাদ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হীন স্বার্থকে চরিতার্থ করাই শিক্ষা মনে করে, তবে আমি বলবো, তাদের বোধ-বুদ্ধি আত্ম-জাগৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারেনি। তাদের শিক্ষা একটি খোলসমাত্র।'

তিনি আক্ষেপ করে বলছেন – 'যে শিক্ষা মানুষকে দেশপ্রেম শিখায় না, যে শিক্ষা মানুষের মনে মানুষের জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করে না, যে শিক্ষা শুধুমাত্র আত্ম-সুখকেন্দ্রিক, সে শিক্ষার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। আত্মসর্বস্ব এই শিক্ষা আমাদের অন্বিষ্ট হতে পারে না।'

শিক্ষাবিষয়ক তৃতীয় প্রবন্ধ 'প্রকৃত শিক্ষার স্বরূপসন্ধানে'। 'বিদ্যালয়ে বিদ্যা নেই' লেখাটিতে তিনি কোচিং সেন্টারকেন্দ্রিক ছাত্রছাত্রীদের রেডিমেড শিক্ষা গলাধঃকরণের প্রসঙ্গটি এনেছেন। অতীতের শিক্ষার সাথে বর্তমানের ফারাক এবং তার শৈশবের শিক্ষকদের মূল্যবোধ তুলে ধরেছেন।

'স্কুলকলেজে লেখাপড়া বনাম প্রাইভেট টিউশন' লেখার জন্য লেখা হয়ে গেছে। নিরীক্ষাধর্মী হয়নি। তার বেশিরভাগ লেখা হালকা চালের। পত্রিকায় কলাম লেখা ধরনের।

তবে 'শিশুরাও শিক্ষক হতে পারে' একটি সুন্দর লেখা। এখানে শিশুর সারল্যকে উপজীব্য করে টলস্টয়ের 'শিশুরা তাদের বড়দের চেয়ে বিজ্ঞতর হতে পারে' গল্পটির উদাহরণ টেনে তিনি লেখাটি শেষ করেছেন। কিন্তু কথা প্রসঙ্গে লেখক সামাজিক বিভক্তির জাঁতাকলে শিশুর শিশুত্ব হারানোর বিষয়টি প্রশ্নাকারে উত্থাপন করেছেন।

'আলোকিত মানুষ গঠনে শিক্ষকের ভূমিকা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' লেখাটিতে তিনি শিক্ষকদের দায়িত্বশীল ভূমিকার যেমন তাগিদ দিচ্ছেন তেমনি শিক্ষকদের সামগ্রিক স্বাচ্ছন্দ্যের নিশ্চয়তার দাবী করে সমাজের দায়িত্বশীল মহলকেও সচেতন করেছেন। বলছেন – বর্তমানে শিক্ষা দ্রুত পণ্যে পরিণত হচ্ছে। শিক্ষায়তনের বাইরেও শিক্ষাপণ্যের বিশাল বিশাল সুপারমার্কেট তৈরি হয়েছে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে শিক্ষাব্যবস্থায় বিরাজমান আর্থ-সামাজিক ক্রিয়াকর্মের প্রতিফলন ঘটবেই। বণিক পুঁজির আগ্রাসনে সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থা আজকে হুমকির সম্মুখীন।

শিক্ষাবিষয়ক শেষ লেখাটি হলো 'সমন্বিত শিক্ষা ও সংস্কৃতি: প্রাসঙ্গিক ভাবনা'। কী-কী গুণ থাকলে মানুষ মানুষ হয়ে ওঠে? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলছেন – শিক্ষা, শিক্ষা এবং শিক্ষা। লেখক আবুল মোমেনের উক্তি উদ্ধৃত করে তিনি বলছেন – 'প্রাণিকুলে মানুষকেই শুধু মানুষ হতে হয়। কিন্তু মানুষ যাতে মানুষ না হয়ে ওঠে তার জন্যই আজ সারা পৃথিবীতে তোড়জোড় যেন বেশি। আজ মানুষ দেখাই যাচ্ছে না। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, উঁচু, নিচু, শ্বেতাঙ্গ, নিগ্রো, ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যান্ট ইত্যাদি পরিচয় মানুষ বিশেষ্যটিকে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলেছে।'

লেখক বলছেন আমরা যেন মানুষের বদলে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, টেকনোক্র্যাট হতে চাচ্ছি। যে সমাজে ধনের সম্মান বেশি সেখানে ধনী হতে চাওয়াটাই স্বাভাবিক। এখন সবার বুকে এই একটি শব্দই তো প্রতিধ্বনিত হচ্ছে – যেকোন উপায়ে ধনী হবো। লেখকের প্রত্যাশা তারপরও মানুষ হবার চেষ্টা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। ■

লেখক: কবি ও চিত্রশিল্পী

তিনি আক্ষেপ করে বলছেন – 'যে শিক্ষা মানুষকে দেশপ্রেম শিখায় না, যে শিক্ষা মানুষের মনে মানুষের জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করে না, যে শিক্ষা শুধুমাত্র আত্ম-সুখকেন্দ্রিক, সে শিক্ষার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। আত্মসর্বস্ব এই শিক্ষা আমাদের অন্বিষ্ট হতে পারে না।'

পাঠাগার আন্দোলনের নতুন দিগন্ত

অলোক আচার্য

পাবনা কাশিনাথপুরের স্কাইলার্ক স্কুল রোডে প্রতিষ্ঠিত পথপাঠাগার

ইনসেটে উদ্যোক্তা আলাউল হোসেন

> শিক্ষার্থীদেরকে ১২-১৪টি পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি বছরে ১২টি করে সৃজনশীল বই পড়ানোর ব্যবস্থা করা গেলে ভার্চুয়াল জগৎ থেকে খুব সহজেই তারা নিজেদের রক্ষা করতে পারবে। এ ছাড়া সমাজ পরিবর্তনের আর কোন হাতিয়ার আমি দেখি না

বর্তমান সমাজে বই পড়া আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে একটি লাইব্রেরির যে ঠিক কতখানি প্রয়োজন তা অনুধাবন করার মতো খুব বেশি মানুষ পাওয়া যাবে না। গুটি কতক যে মানুষ বই পড়ার সেই সোনালী চর্চা ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করছেন তারা খুব বেশিদূর এগুতে পারছেন না। এর বহুমুখী কারণও রয়েছে। এর মাঝেও কিছু মানুষ হাল ছেড়ে দিচ্ছেন না। তাদের একজন হলেন শিক্ষক, সাংবাদিক এবং কবি-গীতিকার আলাউল হোসেন। সম্প্রতি তিনি রাস্তার ধারেই লাইব্রেরি তৈরি করেছেন। সেখান থেকে যে কেউ ইচ্ছে মতো বই নিয়ে পড়ছে আবার রেখেও দিচ্ছে। ঘটনাটি রীতিমতো নতুন প্রজন্মের মাঝে আন্দোলন তৈরি

করেছে। সেটি হলো বই পড়া আন্দোলন। বর্তমান প্রজন্ম ক্রমাগত বই বিমুখ হয়ে যাচ্ছে। মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু বই হলেও তরুণ প্রজন্মের ভেতর বই পড়ার আগ্রহ হ্রাস পাচ্ছে। আমাদের তরুণ প্রজন্মে চিরায়ত বই পড়ার দৃশ্য বদলে যাচ্ছে। একসময় মানুষের আনন্দের অন্যতম প্রধান উপকরণ ছিল বই। এখন বিনোদনের বহু উপকরণ যোগ হয়েছে। বিপরীতে দূরে সরেছে বই।

পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার কাশিনাথপুরে স্কাইলার্ক ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের মূল ফটকের বাইরে রাস্তার পাশে গড়ে উঠেছে এই পাঠাগারটি। নাম দেওয়া হয়েছে স্কাইলার্ক পথপাঠাগার। এই লাইব্রেরি কেন অন্য লাইব্রেরি থেকে আলাদা তার পেছনে কারণ হলো এখানে যেকোনো পথচারী রেজিস্টারে নিজের নাম-ঠিকানা আর ফোন নাম্বার লিখে নিজের ইচ্ছেমতো বিনামূল্যে বই নিতে পারেন। পড়ার পর বইটি ফেরত দিলেই চলে।

আলাউল হোসেন তার ব্যক্তিগত সংগ্রহের নতুন পুরোনো প্রায় শতাধিক বই দিয়ে কাজটি শুরু করেছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো প্রতিষ্ঠার পাঁচ দিনের মধ্যেই পাঠাগারটির বই পাঁচ শতাধিক ছাড়িয়ে যায়। অনেকেই নিজের সংগ্রহের বই দিয়ে পাঠাগারটি সমৃদ্ধ করছেন। আর প্রতিদিন গড়ে ৫০-৬০ জন পথচারী সেখান থেকে বই নিয়ে পড়ছেন। যদি বাংলাদেশে আলাউল হোসেনের মতো আরও অনেক আলাউল হোসেন এগিয়ে আসেন, যদি প্রতিটি উপজেলায় এরকম বিশালাকার সংগ্রহের একটি পাঠাগার পথের ধারে থাকে তাহলে এই প্রজন্মকে বইমুখী করার ক্ষেত্রে তা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

মুক্তবুদ্ধি চর্চার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা প্রয়োজনীয় বই পাওয়ার অভাব। অর্থাৎ হাতের কাছে যদি বই না পাওয়া যায় তাহলে আমার পড়ার সুযোগ তৈরি হবে কিভাবে? টাকা দিয়ে সবাই কিনে বই পড়ে না। সবার সামর্থ্যও থাকে না। বিশেষ করে স্কুলকলেজের ছাত্রছাত্রীদের। আলাউল হোসেনের এই পথপাঠাগারে ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বই এসেছে। আরও বহু মানুষ বই পাঠানোর জন্য যোগাযোগ করছেন। এই পাঠাগারটির দায়িত্ব রয়েছে কয়েকজন মানুষের হাতে। সাথে শিক্ষার্থীও রয়েছে। যাই হোক পাঠাগার আন্দোলন যে একটি আন্দোলন তা এখান থেকেই শুরু হোক শক্তভাবে।

এ ব্যাপারে আলাউল হোসেন বলেন, "শুরুটা নিজ এলাকা কাশিনাথপুরে হলেও ইচ্ছে আছে জেলাব্যাপী এর পরিসর বাড়ানোর। পাবনা জেলার প্রতিটি উপজেলায় ১টি করে পথপাঠাগার করতে চাই। প্রতি উপজেলায় কমপক্ষে ৫ জন করে উদ্যোমী তরুণ পেলেই কাজ শুরু করবো। তরুণদেরকে সম্পৃক্ত না করতে পারলে মফস্বলে পাঠাগার আন্দোলন করে কোন লাভ হবে না। রাজধানীসহ দেশের ৬৪ জেলার গণগ্রন্থাগারে লক্ষ লক্ষ বই সাজানো আছে। প্রতি বছর সরকার কোটি কোটি টাকার বই বরাদ্দ করছে ওই সব গ্রন্থাগারে। কিন্তু ফলপ্রসূ হচ্ছে কি? শিশু-কিশোর-তরুণদের তেমন কাউকেই গণগ্রন্থাগারে (নিজ জেলার কথা আমি নিশ্চিত জানি) যেতে দেখি না। তাহলে পাঠক বাড়বে কিভাবে? আমার মনে হয় দেশের প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠাগারে শিক্ষার্থীদের উপযোগী বই সংগ্রহ করে মাসে অন্তত একটি করে বই বাধ্যতামূলক পাঠ করানো উচিত। সারাদেশের গণগ্রন্থাগারে বইয়ের বরাদ্দ কমিয়ে দিয়ে স্কুলপাঠাগারে শিক্ষার্থী-উপযোগী বই বরাদ্দ দিয়ে শিক্ষামন্ত্রণালয় কর্তৃক বাধ্যতামূলক পাঠচক্র পরিচালনার নির্দেশনা আসা প্রয়োজন।

"শিক্ষার্থীদেরকে ১২-১৪টি পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি বছরে ১২টি করে সৃজনশীল বই পড়ানোর ব্যবস্থা করা গেলে ভার্চুয়াল জগৎ থেকে খুব সহজেই তারা নিজেদের রক্ষা করতে পারবে। এ ছাড়া সমাজ পরিবর্তনের আর কোন হাতিয়ার আমি দেখি না।"

যে কাজটি আলাউল হোসেন করছেন তা করার মতো সামর্থ্য এদেশে আরও বহু মানুষের আছে। সবাই মিলে একটু চেষ্টা করলেই এ আন্দোলন সফল হবে – মুক্ত হবে পাঠাগার আন্দালনের এক নতুন দিগন্ত। ■

লেখক: শিক্ষক ও মুক্তগদ্য লেখক

ঋণ বিতরণ উদ্বোধন করছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক (ছবিতে বাম থেকে ২য়)

সিদীপে যোগ হলো আরও নতুন ২০টি নতুন শাখা। ২৪ জানুয়ারি ২০২২ সিদীপের শীর্ষ কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে এই নতুন শাখাসমূহ উদ্বোধন করা হয়। ফরিদপুর সদর শাখার ঋণ বিতরণ উদ্বোধন করেন সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা। নতুন এই শাখাগুলো হচ্ছে : নবগঠিত মাদারীপুর জোনের ফরিদপুর এরিয়ার ফরিদপুর সদর, গোয়ালন্দ, হাট কৃষ্ণপুর, রাজবাড়ী সদর ও সদরপুর; মাদারীপুর এরিয়ার মাদারীপুর সদর, মোস্তফাপুর, শেখপুর, শিবচর ও টেকেরহাট; শরীয়তপুর এরিয়ার ভেদরগঞ্জ, গোসাইরহাট, শরীয়তপুর সদর ও ভজেশ্বর এবং গাজীপুর জোনের নবগঠিত সখিপুর এরিয়ার বড় চওনা বাজার, গোড়াই, কালিয়াকৈর, সখিপুর ও তক্তারচালা।

হারিয়ে যাওয়া বাংলার ঐতিহ্য

আশরাফ আহমেদ

সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক আত্মীয়ের বিয়েতে বাংলার হারিয়ে যাওয়া একটি ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস দেখে মনটি আনন্দে ভরে উঠেছিল। আমাদের দেশে বিয়েবাড়িটি সাজানো হত রঙ-বেরঙের পাতলা কাগজে তৈরি তিনকোণা নিশান দিয়ে। শাশ্বত কিনা জানি না, কিন্তু বিয়েবাড়ির এমন দৃশ্য শুধু আমার মানসপটেই নয়, আশির দশকের আগের গল্প-উপন্যাস ও সিনেমায়ও তাই দেখানো হতো। শেষ যে সিনেমায় এমন দৃশ্য দেখেছিলাম সেটি ছিল হুমায়ুন আহমেদের 'শ্রাবণ মেঘের দিন'। বিত্ত আয়ত্ত এবং শহরায়নের সাথে সাথে এর সবই এখন লোপ পেয়েছে। ঐতিহ্যের এই বিলুপ্তির কথা মনে হলেই চিত্তটি হুহু করে ওঠে। ঢাকার বহুতল ভবনের ছাদে অনুষ্ঠিত সেই বিয়ে বাড়িটিতে লম্বা লম্বা দড়িতে সাঁটা অবিকল ঐ রকমের ত্রিকোণাকৃতির নিশান দেখে ক্ষীণ হলেও একটি আশার সঞ্চার হয়েছে। নতুন প্রজন্মের অন্তত কিছু লোক আমাদের ঐতিহ্যকে ধরে রাখার চেষ্টা করছে।

তখনকার বাংলাদেশে বিয়েতে একটি প্রীতি-উপহার দেয়া হতো। সেটি হতো বিয়ে হতে যাওয়া বর, কনে অথবা উভয়ের উদ্দেশে তাদের নিকটজনের হৃদয়নিংড়ানো ভাষায় লিখিত ছড়া বা কবিতা। দুই পাশে আঁকা দুটি পাখি, মালা হাতে দুই পরী বা লতাপাতার চিত্রসহ সেটি ছাপা হতো একটি রঙিন কাগজে। বিয়ের আসরে তা পড়া হতো এবং অতিথিদের মাঝে বিতরণ করা হতো। লেখাগুলো শুনে বা পড়ে অতিথিদের চোখে জল এসে যেত। একটি সময় ছিল যখন লোকজন সেই কাগজটি যত্ন করে সংরক্ষণও করতো। কিন্তু প্রায় পঞ্চান্ন বছর থেকে কোনো বিয়েতেই এ ধরনের কোনো প্রীতি উপহার আমার চোখে পড়েনি।

কয়েক মাস আগে ১৯৯৪ সালে পৃথিবী ছেড়ে যাওয়া আমার মায়ের রক্ষিত কিছু প্রিয় কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছিলাম। সেখানে

সযত্নে ভাঁজ করা কিন্তু কিছুটা কুঁচকে যাওয়া কাগজে হাত লাগতেই দেহে এক চমৎকার অনুভূতির শিহরণ বয়ে গেল। কানে বেজে উঠলো সানাইয়ের করুণ সুর! ভাঁজ খুলতেই বেরিয়ে এলো অসংখ্য মনমাতানো রঙিন পাখনাওয়ালা প্রজাপতি। প্রতিটি নেচে নেচে আমার নাকে, মুখে, গালে ও কপালে বসে অনুনয় করতে লাগলো তাদের নিয়ে চারণ করতে। আনন্দে দম বন্ধ হয়ে আসার জোগাড়! কাকে ছেড়ে কার অনুনয় রক্ষা করি! সেদিনের প্রতিটি দৃশ্য ছবির মতো হুমড়ি খেয়ে পড়লো আমার চোখের সামনে। বাড়ি সাজানো, বাড়ি ভর্তি লোক, গেইট ধরা, জুতা চুরি করা, সবার চেয়ে একটি বেশি মিষ্টি খাওয়া ইত্যাদি।

সেই দিনটি ছিল ১৯৬৩ সালের নভেম্বরের ২২ তারিখ। আমি অন্নদা স্কুলে ক্লাশ এইটের ছাত্র। আমার থেকে বছর চারেকের বড় চাচাত বোন সুলতানা আপার বিয়ে। ভাঁজ করা বস্তুটি ছিল খুব হালকা গোলাপি রঙের তুলোট চারকোণা কাগজে ছাপা একটি 'ভক্তি-উপহার'। ভাই ও ভাবির উদ্দেশে হামিদ দুলাভাইয়ের ছোট ভাইবোনদের লেখা দুটি ছড়া। কদিন থেকেই চারিদিকে সাজসাজ রব। রাস্তার দিকের খোলা জায়গাটিতে কাপড়ের দেয়াল ও বাড়ির সামনের মাঠে সামিয়ানা টাঙানো হল। কোথা থেকে দুটো কলাগাছ এনে গেইট বানানো হলো। বাড়ির ভেতরে মাটি খুঁড়ে তিনটি বিশাল চুলা জ্বালানো হলো। দুপুর থেকে তিনটি বিশাল মণি ডেগে (ডেকচিতে) রান্না চড়ানো হলো। কলেজে পড়ুয়া বড়ভাই রঙিন কাগজ কেটে কেটে নানান নক্সা বানাচ্ছেন। আমরা ছোটরা মহা উৎসাহে সেগুলোতে আঠা লাগিয়ে গেইট, মাঠ, বা ঘরের ভেতরে বরের বসার স্থানের পেছনে তার নির্দেশমতো লাগিয়ে দিচ্ছি। দেখতে দেখতে বরযাত্রী আগমনের সময় হয়ে এল।

কনের ছোট ভাইদের মাঝে বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা হিসেবে আমাকে দায়িত্ব দেয়া হল। ছোট ছোট ভাইবোনদের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে গেইটের কল্পিত দরজা বানিয়ে একটি বাঁশকে সমান্তরালভাবে ধরে আমি দাঁড়িয়ে আছি। বরকে বরণ করার উদ্দেশ্যে নয়, ভদ্র ভাষায় গেইটে টাকা দাবি করতে, কিন্তু রূঢ় ভাষায় চাঁদাবাজি করতে। সবাই শিখিয়ে দিয়েছিল পঞ্চাশ টাকার কমে যেন কোনোমতেই রাজি না হই, তবে বেশি দেরি হয়ে গেলে পঁচিশ টাকা হলেই চলবে।

> আগের রাতের প্রীতি-উপহারটিতে যে তারিখটি দেয়া আছে, আমার বিশ্বাস তা ছিল এক দিন আগের, যেদিন সেটি ঢাকায় ছাপানো হয়েছিল। কাগজটির বাঁয়ের মার্জিনে ইংরেজিতে আমার অসম্পূর্ণ নামের সই করা আছে। মনে পড়লো আরো অনেক কিছুর মতো স্মৃতি হিসেবে এটি আমার ছোট্ট টিনের সুটকেসের ভেতরে আগলে রেখেছিলাম। আমার অবর্তমানে আম্মা সেটি সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন

কিন্তু আমি কি তাদের চেয়ে কম স্মার্ট? দাবি করলাম একশত টাকা, এর কমে কিছুতেই নয়, প্রয়োজনে বরকে ফিরতি ট্রেনে ঢাকায় ফিরে যেতে হবে। খুশিতে আমার সৈন্যসামন্তও হুংকার দিয়ে উঠল। যুদ্ধে পরাজিত বরপক্ষ এক বান্ডিল কড়কড়ে নতুন টাকার সড়ড়ড়ড় সড়ড়ড়ড় শব্দ শুনিয়ে বিরস মুখে বললেন নাও, এই নাও তোমার একশত টাকা। এক নিমেষে স্তব্ধ হয়ে যাওয়া সেনাবাহিনীকে উপেক্ষা করে আমি টাকা গুনতে উদ্যোগ নিতেই পেছন থেকে বাকী ভাই বলে উঠলেন, গুনতে হবে না, পকেটে ভর, পালা পালা, এতো টাকা এখনই কেউ ছিনিয়ে নেবে। বলেই ক্ষান্ত হলেন না, তিনি এক হেঁচকায় বাঁশশুদ্ধ আমাকে পেছনে টেনে নিয়ে আবার তাড়া দিলেন, পালা এখান থেকে!

পকেটটি ভারি করে আমি পালালাম। বাহিনীর সদস্যদের প্রত্যেককে বখরা দেয়া হবে আশ্বস্ত করে বিজয়ীর বেশে ফিরে এলাম বিয়ের আসরে। কেউ জিজ্ঞেস করলেন, কতো টাকা পেয়েছো? বললাম কতো আবার, যা চেয়েছিলাম তাই, একশত টাকা। বরপক্ষের লোকজন পরস্পরের দিকে চেয়ে মুচকি হাসলেন। সেই বাকী ভাইই আবার কাছে এসে বললেন, এই, তুই কত টাকা পেয়েছিস রে? বললাম কেন, একশত! তিনি বললেন, না গুনে দেখ, ওরা বলছে মাত্র দুই টাকা। পকেটের ভেতর হাত দিয়ে অনুভব করা আনকোরা মোটা বান্ডিলটি মাত্র দুই টাকা হবে, তা বিশ্বাস করার কোনো কারণ ছিল না।

তবুও সবার সামনে খুলে দেখলাম! তাইতো! কড়কড়ে দুটো এক টাকার নোটের মাঝে ছিল টাকার মতো দেখতে অসংখ্য ফালতু কাগজ। অপমানে চোখে জল এসে গিয়েছিল! সৈন্যসামন্তকে দেয়া অঙ্গীকার পূরণ করতে চাঁদাবাজি ছেড়ে তখন

চুরিবিদ্যার আশ্রয় নিয়েছিলাম। হাতেখড়ি হয়েছিল জুতা চুরির!

বরের খালাত ভাই ছিলেন আমার এক ফুপাত বোনের বর, হাশেম দুলাভাই। অত্যন্ত আমুদে এবং আসর জমিয়ে রাখতে ওস্তাদ! ঢাকার সাতরওজায় গ্লোব প্রিন্টিং প্রেস নামে তাঁর ছিল একটি স্বয়ংক্রিয় ছাপাখানা। সেখানেই তিনি দুই টাকাকে একশত টাকায় রূপান্তরিত করেছিলেন। না, শেষ পর্যন্ত তাঁরা আমাকে ফাঁকি দেননি। তিরিশ বা চল্লিশ টাকা ঠিকই দিয়েছিলেন। এরপর যতোবার তাঁদের সাথে দেখা হয়েছে, প্রতিবার তাঁদের সেই নির্মল চাতুর্যের কথা স্মরণ করে হেসেছি।

নতুন হামিদ দুলাভাই ও সুলতানা আপা আমাকে খুব স্নেহ করতেন। তাদের সাথে শেষ দেখা হয়েছিল আজ থেকে সিকি শতাব্দিরও আগে, ১৯৯৪ সালে ঢাকায়। তিলে তিলে মৃত্যুতে ঢলে পড়া তাদের স্কুল-পড়ুয়া এক কন্যার শেষ বিদায়ের দিনে তাঁদের বাসায়। সুলতানা আপার সাথে ফোনে কথা হয়েছিল দশ বা পনের বছর আগে যখন তিনি কানাডায় এসেছিলেন। হাশেম দুলাভাইয়েরও খুব আদরের শ্যালক ছিলাম আমি, ২০১৭র ডিসেম্বরে শেষ দেখা হয়েছিল ঢাকায়। আজ তাঁদের কেউ বেঁচে নেই। বেঁচে নেই বড় ভাই ও বাকী ভাইও।

আজ সেই না ফেরার দেশ থেকে তাঁরা ফিরে এসেছেন সুন্দর এই তুলোট কাগজের 'প্রীতি-উপহার'-এ ভর করে। বলছেন, তোমরা কি বাংলার বুক থেকে আমাদের চিরবিদায় দিয়ে দিতে চাও? এই মাটিতে, এই বাতাসে যে আমরা মিশে আছি তা কি তোমরা অস্বীকার করতে চাও?

বিয়ের পর সুলতানা আপাকে নিয়ে বরপক্ষ রাতের ট্রেনে রওনা হয়ে গেল। পরদিন সকালে ২২শে নভেম্বর তারিখটি পৃথিবী থেকে তখনো বিদায় নেয়নি। বিদায় নেয়নি মাঠের সামিয়ানা ও কলাগাছের গেইট। বিদায় নেয়নি বিয়েবাড়ির অতিথিরাও। বারান্দায় বসে আব্বা তাঁদের সাথে গল্প করছেন। আমি পাশে দাঁড়িয়ে শুনছি। মেঝভাইকে নাশতার জন্য কলা, মাঠাভর্তি জগ ও বিস্কুটের ঠোঙা হাতে ফিরে আসতে দেখা গেল। কিন্তু মাঠ থেকেই তাঁর উত্তেজিত স্বর কানে এলো, আব্বা, আততায়ীর গুলিতে প্রেসিডেন্ট কেনেডি নিহত হয়েছেন। ঘোড়াপট্টির দোকানের রেডিওতে খবরটি তিনি শুনে এসেছেন। আগের রাতে সুলতানা আপাকে বিদায় জানাবার আগে বাড়িতে যে কান্নার রোল উঠেছিল, পুরো আমেরিকা এর চেয়েও বেশি জোরে অশ্রুপাত করছে। বিয়ের সানাইয়ের কান্নার সুর আমার কানে বিউগিল হয়ে বাজছে।

আগের রাতের প্রীতি-উপহারটিতে যে তারিখটি দেয়া আছে, আমার বিশ্বাস তা ছিল এক দিন আগের, যেদিন সেটি ঢাকায় ছাপানো হয়েছিল। কাগজটির বাঁয়ের মার্জিনে ইংরেজিতে আমার অসম্পূর্ণ নামের সই করা আছে। মনে পড়লো আরো অনেক কিছুর মতো স্মৃতি হিসেবে এটি আমার ছোট্ট টিনের সুটকেসের ভেতরে আগলে রেখেছিলাম। আমার অবর্তমানে আম্মা সেটি সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন।

ইংরেজ কবি শেলীর বিখ্যাত কবিতার দুটি লাইন মনে পড়লো:

Our sweetest songs are those that tell of saddest thought

আমাদের সবচেয়ে মধুর সংগীতের মাঝেই জীবনের সবচেয়ে কষ্টগুলো লুকিয়ে থাকে

অথবা

আমাদের জীবনের সবচেয়ে দুঃখের ভাবনাগুলোই মধুর সঙ্গীত হয়ে ধরা দেয়। ■

৩১শে জানুয়ারি ২০২২
পটোম্যাক, মেরিল্যান্ড

লেখক: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বিজ্ঞানী ও লেখক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক। মুক্তিযুদ্ধ, বিজ্ঞান বিষয়ক রম্য রচনা, সমাজ ও ভ্রমণ-নির্ভর বেশ ক'টি গল্পের বই ও উপন্যাস লিখেছেন।

৯ জানুয়ারি পিঠা উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

পহেলা ফাল্গুনে প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মীকে ফুলেল শুভেচ্ছা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

অমর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে সিদীপ প্রধান কার্যালয়ে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এতে বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা, পরিচালক (ফাইন্যান্স এন্ড অপারেশন্স) জনাব এস. আবদুল আহাদ, গবেষণা ও ডকুমেন্টেশন কর্মকর্তা মনজুর শামস এবং ব্যবস্থাপনা শিক্ষার্থী মো. তাওহীদুন্নবী। আবৃত্তি করেন মনজুর শামস, মিঠুন দেব, শারমিন সুলতানা ও আলমগীর খান। সঙ্গীত পরিবেশন করেন মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, জাহিদুল ইসলাম পলাশ, নুরুননাহার নিশি, অভিব ইকবাল, তাওহীদুন্নবী, আফরিন হোসেন ফারিতা, পূবালী রানি সূত্রধর, শারমিন সুলতানা ও অন্যান্য।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সিদীপের প্রধান কার্যালয়ে একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। এবারকার নারী দিবসের প্রতিজ্ঞা পক্ষপাতিত্ব ভেঙে ফেলা। সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা বলেন, "নারী ও পুরুষ মিলে মানব সভ্যতা। নারীমুক্তির প্রতিশ্রুতি আমাদের সকল কর্মসূচির অংশ। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, কর্মক্ষেত্রে ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমরা নারীর প্রতি যথাযথ সম্মান ও জেন্ডার সমতার মূল্যবোধকে ধারণ করবো, নারীপুরুষ ভেদে পক্ষপাতমূলক আচরণকে না বলবো এবং টেকসই আগামীর জন্য নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক জাতীয় অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখবো।"

বিকেলে সিদীপ প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মীর অংশগ্রহণে আয়োজিত সভায় আলোচনা করেন সিদীপের পরিচালক (ফিন্যান্স অ্যান্ড অপারেশন্স) জনাব এস. এ. আহাদ, এসিসট্যান্ট ম্যানেজার মাহমুদা আক্তার এবং অতিরিক্ত পরিচালক (স্পেশাল প্রোগ্রাম) জনাব আবদুল কাদির সরকার। ম্যানেজার (ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অ্যান্ড অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট) ফারহানা ইয়াসমিন নারী দিবসের এবারের থিম 'ব্রেক দ্য বাইয়াস'-এর ওপর নির্মিত একটি ভিডিও চিত্র উপস্থাপন করেন। মাঠ পর্যায়ে সিদীপের প্রতিটি শাখায়ও এ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর, অর্থনীতিবিদ, উন্নয়ন গবেষক ও লেখক ড. আতিউর রহমান তাঁর সাম্প্রতিক প্রকাশিত 'গুণীজন শুভজন' গ্রন্থে (আলোঘর প্রকাশনা, ২০২২) জাতীয় পর্যায়ের মহান ব্যক্তিদেরকে নিয়ে আলোচনা করেছেন। এটি এ সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বই।

বইটিতে অন্তর্ভুক্ত একটি লেখা সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক ও শিক্ষালোকের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মোহাম্মদ ইয়াহিয়াকে (১৯৫০ - ২০২০) নিয়ে: 'উন্নয়নভুবনে আপনজন হয়ে থাকবেন গবেষক ইয়াহিয়া' - পৃ. ১৫৬।